উন্নয়নের আমলনামা

কল্লোল মোস্তফা

বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে সরকারি বয়ান এখন অবিরাম বিজ্ঞাপনের বিষয়। বিজ্ঞাপনী প্রচার একচেটিয়াভাবে সমাজ চৈতন্যে আধিপত্য বিস্তার করায় উন্নয়ন নামে প্রচারিত তৎপরতা আসলে সর্বজনের জীবনে কী ফলাফল নিয়ে আসছে তাও ঢাকা পড়ে যায়। বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সমর্থন ও প্রশংসায়, দেশি বিদেশি লুটেরা শক্তির স্বার্থে জোরজবরদস্তিমূলকভাবে যে উন্নয়ন মডেল চলছে বিস্তারিত তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে তার আসল চেহারা তুলে ধরা হয়েছে এই লেখায়।

উন্নয়ন বলতে মানুষের জীবনমানের সার্বিক উন্নয়নকেই বোঝায়। সেই হিসাবে কোন দেশের উন্নয়ন হওয়ার অর্থ হল নিরাপদ খাদ্য ও পানি, সবার জন্য স্বল্পমূল্যে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও চিকিৎসা, পর্যাপ্ত গণপরিবহন, যানজট ও দুর্ঘটনামুক্ত নিরাপদ সড়ক, দূষণমুক্ত পরিবেশ, জীবনের নিরাপত্তা, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান, যথাযথ শ্রম অধিকার, গণতন্ত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদির নিশ্চয়তা তৈরি হওয়া। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনরা যখন ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে বলে দাবি করেন, তখন জীবনমানের উন্নয়নের কথা না বলে কতগুলো অবকাঠামো উন্নয়নের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন, ক্রমাগত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যান প্রচার করেন।

ক্ষমতাসীনদের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একদিকে এগুলো দ্রুত ও সহজে দৃশ্যমান করা যায়, অন্যদিকে এগুলোর মাধ্যমে গোষ্ঠীগত সুবিধাদি বণ্টন করা সহজ। এসব অবকাঠামো জনগণের কোন কাজে লাগে না, ব্যাপারটা তা নয়। কিন্তু যেহেতু লুটপাট ও প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থেকে এইসব প্রকল্প হাতে নেয়া হয়, তাই অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষা-চিকিৎসার মত গুরুত্বপূর্ণ খাতকে বঞ্চিত করে এইসব অবকাঠামো প্রকল্প হাতে নেয়া হয়, উন্নয়নের দোহাই দিয়ে প্রাণ-প্রকৃতির ঝুঁকি আমলে নেয়া হয় না, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি না থাকায় দুর্নীতি ও অপচয়মূলক হয় এবং অনেক সময় বিদেশি ঋণনির্ভর হওয়ার কারণে অর্থনীতির ওপর বাড়তি ঝুঁকি তৈরি করে। অনেকেই মনে করেন স্বৈরতান্ত্রিক বা কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা না থাকলে বুঝি এসব অবকাঠামোগত উন্নয়ন হওয়া সম্ভব নয়। বাস্তবে কর্তৃত্ববাদী বা স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থারই এই ধরনের দৃশ্যমান অবকাঠামো উন্নয়ন জরুরি হয়ে পড়ে টিকে থাকার বৈধতা অর্জনের জন্য। নিরাপদ খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন সহজে দৃশ্যমান করা যায় না, সর্বজনীন চিকিৎসা ও বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজটি দীর্ঘমেয়াদি, সহজে দৃশ্যমান নয়, সর্বোপরি এসব উদ্যোগ ব্যবসাবান্ধবও নয়। পরিবহনব্যবস্থা গণমুখী করতে গেলে পরিবহন মাফিয়াতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে হবে, দুর্নীতি ও লুটপাট বন্ধ করতে গেলে গোষ্ঠীস্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিজেদের বিচার নিজেদের করতে হবে, যা অসম্ভব। তার চেয়ে সহজ ও লাভজনক হল পশ্চিমা দেশের আদলে কিছু কিছু অবকাঠামো তৈরি করে সেটাকেই উন্নয়ন বলে চালিয়ে দেয়া এবং প্রচার-প্রচারণার মধ্য দিয়ে নাগরিকদের মগজেও সেই ধারণা গেঁথে দেয়া।

কাজেই কোন দেশে কয়টা ফোর লেন, ফ্লাইওভার, শপিং মল আর হাইরাইজ ভবন তৈরি হল, টাকার অঙ্কে প্রবৃদ্ধি কত শতাংশ বাড়ল তা ক্ষমতাসীনদের জন্য উন্নয়নের মাপকাঠি হলেও সর্বজনের জন্য তা যথেষ্ট নয়। সর্বজনের দিক থেকে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হল কোন দেশ দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত হল কি না, ওই দেশে নারী-পুরুষ ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের নিরাপদে বসবাস ও চলাচলের পরিবেশ আছে কি না, বাতাস ও পানি বিশুদ্ধ কি না, সবর্জনীন শিক্ষা-চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কি না ইত্যাদি। এই বিষয়গুলো মাথায় রেখেই এ লেখায় আমরা দেখব অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, পরিবহন ও যাতায়াত, পরিবেশ ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে গত এক দশকে কোন ধরনের উন্নয়ন ঘটেছে, সে উন্নয়নের সুবিধাভোগী কারা।

জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা

উন্নয়নের প্রচারণায় সবচেয়ে বেশি যে পরিসংখ্যানটি ব্যবহৃত হয় তা হল জিডিপি প্রবৃদ্ধি। সরকারি পরিসংখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকায় জিডিপির প্রবৃদ্ধি আসলে কত শতাংশ হয়েছে তা নিয়ে সরকারের সাথে দেশীয় বেসরকারি সংস্থা এবং বিশ্বব্যাংক আইএমএফের মত আন্তর্জাতিক সংস্থার বিতর্কের শেষ নেই। জিডিপি বা মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হিসাব থেকে বোঝা যায় না উৎপাদিত সম্পদ কীভাবে ও কোন অনুপাতে দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে বণ্টিত হচ্ছে। কাজেই জিডিপি প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যান কেন্দ্রিক বিতর্ক ছাপিয়ে যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই প্রবৃদ্ধির সুফল কারা কী হারে ভোগ করছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর করা খানা আয়-ব্যয় জরিপ-২০১৬-এর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০১০ থেকে ২০১৬ সালে জাতীয় আয়ে সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ পরিবারের অংশীদারত্ব ২৪.৬১ থেকে বেড়ে ২৭.৮৯ শতাংশ হয়েছে, অন্যদিকে সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশ পরিবারের অংশীদারত্ব ০.৭৮ শতাংশ থেকে কমে ০.২৩ শতাংশ হয়েছে। টাকার অঙ্কে সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশের গড় মাসিক আয় ২০১০ সালের ৫৬ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ৩২ হাজার ৪৪১ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ৮৮ হাজার ৯৪১ টাকা হয়েছে আর একই সময়ে সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশের আয় ১ হাজার ৭৯১ টাকা থেকে ১ হাজার ৫৮ টাকা হ্রাস পেয়ে ৭৩৩ টাকা হয়েছে।[১] কোটি মানুষকে বঞ্চিত করে কয়েক হাজার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই প্রবণতাটি বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়। ২০০৯ থেকে ২০১৯ সাল–এই ১০ বছরে দেশে কোটিপতি আমানতকারী বেড়েছে ৫৬ হাজার ৬৫০ জন অর্থাৎ বছরে সাড়ে পাঁচ হাজার করে।[২]

মনে রাখা দরকার, এইসব পরিসংখ্যান তৈরি হয়েছে প্রদর্শিত আয়ের হিসাবে, ধনিক গোষ্ঠীর অপ্রদর্শিত আয় আমলে নিলে বৈষম্য আরও বহুগুণ বেশি আকারে ধরা পড়বে। এই অপ্রদর্শিত আয়ের পরিমাণ যে সামান্য নয়, তা ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিন্যানশিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জিএফআই)-এর বার্ষিক প্রতিবেদন থেকেই দেখা যায়। গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৯-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, ২০০৬ থেকে ২০১৫–এই ১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে

পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার ৩০৯ কোটি ডলার বা ৫ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকায়। জিএফআইর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে ৫৯০ কোটি ডলার পাচার হয়েছে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। ২০১৪ সালে দেশ থেকে পাচার হয়েছিল ৮৯৭ কোটি ডলার। সংস্থাটির বক্তব্য অনুসারে, উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যের প্রায় ২০ শতাংশই পাচার হয়েছে নানা কৌশলে। আর পাচারকৃত টাকার বড় অংশই গেছে আমদানি-রফতানির সময়ে পণ্যের প্রকৃত দাম গোপন করার মাধ্যমে।[৩]

ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠন এখন খুব নিয়মিত ঘটনা। গত এক দশকের ব্যাংক লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে যেসব কমন বা সাধারণ কতগুলো প্রবণতা ও পদ্ধতি শনাক্ত করা যায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে–সরাসরি জালিয়াতির মাধ্যমে লুণ্ঠন, ঋণ নিয়ে ব্যবসার পুঁজি গঠন, ঋণ খেলাপ ও লুটপাট, ব্যাংক মালিক হয়ে লুটপাট অর্থাৎ স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগে ব্যাংক উদ্যোক্তা হয়ে জনগণের হাজার কোটি টাকা লুণ্ঠন, ব্যাংকের টাকা লুটে ব্যাংক মালিক এবং পরবর্তীতে আরও লুটপাট, চেয়ারম্যান, রাজনৈতিক মদদে নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এমডি বা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক বিভিন্ন সুবিধার বিনিময়ে ব্যাংক ঋণ ও লুটপাট, ব্যাংক লুটে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা, যেমন–অনিয়ম-দুর্নীতির প্রশ্রয় প্রদান, লুণ্ঠনের হোতাদের বিচার না করা, খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধার না করা, উদারভাবে ঋণ পুনর্গঠন সুবিধা প্রদান, বছর বছর জনগণের করের অর্থ লুটপাটের শিকার ব্যাংকগুলোতে ঢালা ইত্যাদি।[৪]

২০০৯ থেকে ২০১৬–এই সাত বছরে ছয়টি বড় আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে, যার মাধ্যমে ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি চুরি বা আত্মসাৎ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১০ সালের শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারিতে ১৫ হাজার কোটি টাকা, ২০১২ সালে সোনালী ব্যাংকের হলমার্ক কেলেঙ্কারিতে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা, জনতা ব্যাংকের বিসমিলাহ গ্রুপ কেলেঙ্কারিতে ১১০০ কোটি টাকা, ২০১৩ সালে বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারিতে সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।[৫]

শেয়ারবাজারের অনিয়ম তদন্তে ২০১১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদকে প্রধান করে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে, অভিনব কৌশলে লোভের ফাঁদ তৈরি করে শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারি ঘটানো হয়। নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসির সঙ্গে যোগসাজশে ডিএসই ও সিএসই সারা দেশে বাজারের বিস্তৃতি ঘটায়, রোড শো ও গণমাধ্যমে আহ্বান জানিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে শেয়ারের দৈনন্দিন কেনাবেচাকে লোভনীয় করা হয়। এরপর আইপিওর আগে প্রাক-আইপিও পেসমেন্ট বিক্রি, পেসমেন্টের কার্ব বাজার, প্রেফারেন্স শেয়ার, সরাসরি তালিকাভুক্তি, রিপিট আইপিও, কোম্পানি সম্পদের পুনর্মূল্যায়ন, ঋণকে শেয়ারে রূপান্তর, বুক বিল্ডিং ইত্যাদি নতুন ও অভিনব সব প্রস্তাব এনে প্রাথমিক বাজারকে অতিমূল্যায়িত করে এক দফা অর্থ তুলে নেয়া হয়। আর সেকেন্ডারি বাজারে এই অতিমূল্যায়ন ধরে যোগসাজশ ও গোষ্ঠীবদ্ধ লেনদেন করে আরেক দফা মূল্য বাড়ানো হয়। সব শেষে সরকারি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান আইসিবিসহ কয়েকটি মার্চেন্ট ব্যাংকে সংরক্ষিত অমনিবাস হিসাব থেকে ৮৩০০ (ডিএসই) সূচকের সময় বড় অঙ্কের শেয়ার বিক্রি করে বাজারে পতন ঘটানো হয়, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় হাজার হাজার ক্ষুদ্র ও সাধারণ বিনিয়োগকারী।[৬]

উপর্যুক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে বাজারের উত্থান-পতন প্রক্রিয়ায় যেসব প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ভূমিকা রেখেছে, তাদেরকে 'সেকেন্ডারি বাজারের শীর্ষ ঘটকেরা' এবং 'প্রাক-আইপিও আকাশচুম্বী মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় জড়িত ব্যক্তি ও সংস্থা'–এমন দুটি দলে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা হয়। সেই সাথে তদন্ত কমিটি পরিকল্পিতভাবে শেয়ার কিনে বাজারের উত্থান ঘটানোর দুটি পর্ব চিহ্নিত করে। বাজারে বুদ্বুদ সৃষ্টি বা স্ফীতির প্রথম পর্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয় ২০০৯ সালের অক্টোবর-নভেম্বরকে। এ সময় বাজারের সূচক ২৮০০ পয়েন্ট থেকে ৪৫০০ পয়েন্টে ওঠে। আর দ্বিতীয় পর্ব ছিল ২০১০ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি জুড়ে, যখন বাজার সূচক ৪৯৪১ থেকে ৫৬১২ পয়েন্টে ওঠে। তদন্ত প্রতিবেদনে বাজারের 'পতন পর্ব' ধরা হয়েছে ২০১০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরকে, যাকে 'ঝড়ের পূর্ব সময়' বলেও অভিহিত করেছে কমিটি। ২০১০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে বাজারে কমবেশি ৮৩০০ পয়েন্টে লেনদেন চলছিল। প্রতিবেদনে পতন পর্বের ব্যাখ্যায় বলা হয়, বাজারে উত্থানের দুই পর্বে যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান শীর্ষ ক্রেতা ছিল, তাদের অধিকাংশই ২০১০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরের পতন পর্বে ছিল শীর্ষ বিক্রেতা।[৭]

> নিরাপদ খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন সহজে দৃশ্যমান করা যায় না, সর্বজনীন চিকিৎসা ও বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজটি দীর্ঘমেয়াদি, সহজে দৃশ্যমান নয়, সর্বোপরি এসব উদ্যোগ ব্যবসাবান্ধবও নয়। পরিবহনব্যবস্থা গণমুখী করতে গেলে পরিবহন মাফিয়াতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে হবে, দুর্নীতি ও লুটপাট বন্ধ করতে গেলে গোষ্ঠীস্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিজেদের বিচার নিজেদের করতে হবে, যা অসম্ভব। তার চেয়ে সহজ ও লাভজনক হল পশ্চিমা দেশের আদলে কিছু কিছু অবকাঠামো তৈরি করে সেটাকেই উন্নয়ন বলে চালিয়ে দেয়া এবং প্রচার-প্রচারণার মধ্য দিয়ে নাগরিকদের মগজেও সেই ধারণা গেঁথে দেয়া।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার সময় খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা[৮] আর ২০১৯-এর জুন মাস শেষে খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১২ হাজার ৪২৫ কোটি টাকায়, যা বিতরণ করা মোট ঋণের ১১.৬৯ শতাংশ। এর সঙ্গে অবলোপন করা ঋণ যোগ করলে খেলাপি ঋণ দেড় লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।[৯] অর্থাৎ ১০ বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৫ গুণ। এই ঋণখেলাপিদের শাস্তি প্রদান তো দূরের কথা, উল্টো তাদেরকে নানা রকম বাড়তি সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। গত ১৬ মে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ খেলাপিদের সুবিধা দিয়ে 'ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন পরিশোধসংক্রান্ত বিশেষ নীতিমালা' জারি করে। এই নীতিমালা অনুসারে, বকেয়া ঋণের ২ শতাংশ টাকা জমা দিয়েই তাঁরা ঋণ নিয়মিত করতে পারবেন, ঋণ গ্রহণের সময় সুদের হার ১২ বা ১৫ যা-ই হোক না কেন, এই নীতিমালার আওতায় সুদহার হবে সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ। আর এক বছরের ঋণ পরিশোধে বিরতিসহ ১০ বছরের মধ্যে বাকি টাকা শোধ করতে পারবেন। আবার ব্যাংক থেকে নতুন করে ঋণও নিতে পারবেন।[১০]

এভাবে লুণ্ঠন ও দুর্নীতির মাধ্যমে গত এক দশকে বাংলাদেশে ধনিক শ্রেণির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে, যা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের গবেষণায়ও ধরা পড়ছে। ওয়েলথ-এক্স নামের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠানের 'ওয়ার্ল্ড আলট্রা ওয়েলথ রিপোর্ট-২০১৮' থেকে দেখা যায়, ৩ কোটি ডলার বা আড়াই শ কোটি টাকার বেশি সম্পদের মালিক অতিধনী বা ধনকুবেরের সংখ্যা বৃদ্ধির হারের দিক দিয়ে বিশ্বের বড় অর্থনীতির দেশগুলোকে পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। ২০১২ সাল থেকে গত পাঁচ বছরে দেশে ধনকুবেরের সংখ্যা বেড়েছে গড়ে ১৭ শতাংশ হারে, যা এমনকি যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, ভারতসহ ৭৫টি বড় অর্থনীতির দেশের চেয়ে বেশি।[১১] ওয়েলথ-এক্সের আরেকটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে, ১০ লাখ থেকে ৩ কোটি মার্কিন ডলারের সম্পদের মালিক (সাড়ে ৮ কোটি থেকে ২৫০ কোটি টাকা) বা ধনী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির হারের দিক থেকেও বাংলাদেশ এগিয়ে, বিশ্বে তৃতীয়। সংস্থাটির হিসাব অনুসারে, আগামী পাঁচ বছর বাংলাদেশে ধনী মানুষের সংখ্যা ১১.৪ শতাংশ হারে বাড়বে।[১২]

অতিধনী বৃদ্ধির হারের দিকে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম এবং ধনী বৃদ্ধির হারে তৃতীয় হলেও অতিগরিব মানুষের সংখ্যা বেশি এমন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। বিশ্বব্যাংকের 'পভার্টি অ্যান্ড শেয়ার প্রসপারিটি' বা 'দারিদ্র্য ও সমৃদ্ধির অংশীদার-২০১৮' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে ২ কোটি ৪১ লাখ হতদরিদ্র মানুষ আছে। ক্রয়ক্ষমতার সমতা অনুসারে (পিপিপি) যাদের দৈনিক আয় ১ ডলার ৯০ সেন্টের কম, তাদের হতদরিদ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটা আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যরেখা হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশ্বব্যাংক ২০১৬ সালের মূল্যমান ধরে পিপিপি ডলার হিসাব করেছে। বাংলাদেশে প্রতি পিপিপি ডলারের মান ধরা হয়েছে সাড়ে ৩২ টাকা। সেই হিসাবে বাংলাদেশের ২ কোটি ৪১ লাখ লোক দৈনিক ৬১ টাকা ৬০ পয়সাও আয় করতে পারে না। বিশ্বব্যাংক এই হিসাবটি করেছে বাংলাদেশকে নিম্ন আয়ের দেশ ধরে নিয়ে। যদি নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে এই হিসাব করা হয় তাহলে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা আরও বেশি দেখা যায়। নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠতে হলে দৈনিক কমপক্ষে ৩ দশমিক ২ পিপিপি ডলার আয় করতে হবে। বিশ্বব্যাংক বলছে, এভাবে হিসাব করলে বাংলাদেশে অতিগরিব মানুষের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৮ কোটি ৬২ লাখ। আর দারিদ্র্যের হার হবে ৫২.৯ শতাংশ।[১৩]

২০১০ থেকে ২০১৬ সালে জাতীয় আয়ে সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশ পরিবারের অংশীদারত্ব ২৪.৬১ থেকে বেড়ে ২৭.৮৯ শতাংশ হয়েছে, অন্যদিকে সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশ পরিবারের অংশীদারত্ব ০.৭৮ শতাংশ থেকে কমে ০.২৩ শতাংশ হয়েছে। টাকার অঙ্কে সবচেয়ে ধনী ৫ শতাংশের গড় মাসিক আয় ২০১০ সালের ৫৬ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ৩২ হাজার ৪৪১ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬ সালে ৮৮ হাজার ৯৪১ টাকা হয়েছে আর একই সময়ে সবচেয়ে দরিদ্র ৫ শতাংশের আয় ১ হাজার ৭৯১ টাকা থেকে ১ হাজার ৫৮ টাকা হ্রাস পেয়ে ৭৩৩ টাকা হয়েছে।

শ্রমিকের মজুরি ও কর্মপরিবেশ

ধনী ও অতিধনী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় হলেও প্রতিবেশী ও প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় মজুরি বৃদ্ধির হার বাংলাদেশেই কম। ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তিন বছরে বাংলাদেশে যে হারে প্রকৃত মজুরি বেড়েছে, তার চেয়ে বেশি হারে বেড়েছে ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) 'গ্লোবাল ওয়েজ রিপোর্ট ২০১৬/২০১৭ : ওয়েজ ইনইকুয়ালিটি ইন ওয়ার্ক পেস' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রকৃত মজুরি বেড়েছে মোট ১১ শতাংশ। অন্যদিকে ভারতে তা ১৬.৩, পাকিস্তানে ১১.১, ভিয়েতনামে ১২, কম্বোডিয়ায় ৪৪.৩ (দুই বছরে), থাইল্যান্ডে ১৬.৯ এবং চীনে ২১.৯ শতাংশ হারে বেড়েছে।[১৪]

বাংলাদেশের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় অনেক কম। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ২০১৬ সালে আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ঢাকা ও এর উপকণ্ঠে জীবন নির্বাহ মজুরি (লিভিং ওয়েজ) হিসাব করে। আইএলও স্বীকৃত অ্যাংকার মেথডোলজির ভিত্তিতে লিভিং ওয়েজ হিসাব করতে বিবেচনায় নেয়া হয় মানসম্পন্ন জীবনযাপনের জন্য খাদ্য, পানি, আবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবহন, পোশাক, অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা মোকাবেলা ও অন্যান্য অপরিহার্য প্রয়োজনকে। ঢাকার মিরপুর ও পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, আশুলিয়ার শ্রমিকদের দৈনন্দিন খরচের মাঠপর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সংস্থাটি দেখায়, ঢাকার উপকণ্ঠের শহরগুলোয় শ্রমিকের লিভিং ওয়েজ ১৩ হাজার ৬৩০ এবং ঢাকা শহরে ১৬ হাজার ৪৬০ টাকা। অথচ তৈরি পোশাক, বস্ত্র, ট্যানারি, ফার্মাসিউটিক্যাল ইত্যাদি সকল খাতের মজুরি লিভিং ওয়েজের নিচে। ট্যানারি, ফার্মাসিউটিক্যাল ও পোশাক শ্রমিকদের জন্য সর্বনিম্ন মাসিক মোট মজুরি ঘোষিত হয়েছে যথাক্রমে শ্রমিকদের ১২ হাজার ৮০০, আট হাজার ৫০ ও আট হাজার টাকা। ঢাকায় কার্যক্রম আছে এমন বাকি অন্য সব শিল্পের সর্বনিম্ন মাসিক মোট মজুরিই ৬ হাজার টাকার নিচে।[১৫]

অক্সফামের 'মেড ইন পভার্টি, দ্য ট্রু প্রাইস অব ফ্যাশন : হোয়াট শি মেকস' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে জীবনযাপনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মজুরি না পাওয়ার কারণে ৮৭ শতাংশ শ্রমিক জীবন চালান ঋণ নিয়ে। তাঁদের দৈনন্দিন কেনাকাটাও হয় বাকিতে। ৫৬ শতাংশ পোশাক শ্রমিক স্থানীয় দোকান থেকে বাকিতে পণ্য কিনে থাকেন।[১৬] এরকম নিম্নমজুরি কেন্দ্রিক উন্নয়ন অর্থনীতির কারণেই রফতানি আয়ের অন্যতম প্রধান খাত পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা রক্তশূন্যতায় ভোগেন। ২০১৮ সালে ঢাকা ও ময়মনসিংহের চারটি কারখানার ২ হাজার ৬০০ শ্রমিকের ওপর আইসিডিডিআর বি-র গবেষণা থেকে দেখা যায়, ১৮-৪৯ বছর বয়সী ওই নারী শ্রমিকদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে আটজনই রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন।[১৭] আর সমাধান হিসেবে বেঁচে থাকার মত মজুরির ব্যবস্থা না করে নারী শ্রমিকদের রক্তশূন্যতা দূর করতে পুষ্টি চাহিদা পূরণে আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট দেয়ার কর্মসূচি নেয়া হয়। মার্চ ২০১৯-এ নিট পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএ এবং নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল–এনআই এই শিল্পে কর্মরত প্রায় দুই লাখ নারী শ্রমিককে আয়রন ট্যাবলেট সরবরাহ করার কথা জানায় 'নিউট্রিশন অব ওয়ার্কিং উইমেন–এনওডাবিউডাবিউ'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।[১৮]

উন্নয়ন ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির ডামাডোলের মধ্যেই ভয়ংকর অনিরাপদ

কর্মপরিবেশে নিয়মিত মৃত্যুবরণ করছেন বাংলাদেশের শ্রমিকরা। গার্মেন্টস সেক্টরসহ নির্মাণ, কৃষি, দিনমজুর, ইস্পাত, জাহাজ ভাঙা, পাথর ভাঙা ইত্যাদি কোন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতেই শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কোন প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন নেই। ২০১২ সালের ২৪ নভেম্বর কোন ধরনের বিল্ডিং কোড না মেনে নির্মিত জরুরি বহির্গমন সিঁড়িবিহীন তাজরীন ফ্যাশনস নামের পোশাক কারখানায় আগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১১১ জন পোশাক শ্রমিক নিহত হন এবং আহত হন দুই শতাধিক।[১৯] ফাটল ধরা ভবনে কাজ করতে বাধ্য করার কারণে ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ধসে নিহত হন অন্তত ১ হাজার ১৩৫ জন পোশাক শ্রমিক এবং আহত হন অন্তত ১ হাজার ১৬৭ জন।[২০] ২০১৬ সালের ১০ সেপ্টেম্বর অ্যালুমিনিয়াম মোড়ক বা ফয়েল প্রস্তুতকারী টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেডে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডে নিহত হন ৪১ জন।[২১] শুধু রানা প্লাজা বা তাজরীন বা টাম্পাকোর দুর্ঘটনাই নয়, প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা ও অব্যবস্থাপনার কারণে নিয়মিত দুর্ঘটনায় নিহত হচ্ছেন অসংখ্য শ্রমিক, যা কাঠামোগত হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়।

সেফটি অ্যান্ড রাইটস সোসাইটির জরিপ অনুসারে ২০১৮ সালে সারা দেশে ৪৮৪টি কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা হয়। এসব দুর্ঘটনায় মোট ৫৯২ জন শ্রমিক নিহত হন। এর আগে ২০১৭ সালে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা ছিল ৩২৪টি। সে বছর নিহতের সংখ্যা ছিল ৪৩৭। এই হিসাবে গত বছর কর্মস্থলে প্রাণহানি বেড়েছে ৩৫ শতাংশ। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০১৮ সালে সবচেয়ে বেশি ১৮৪ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন নির্মাণ খাতে, যা কর্মস্থলে মোট প্রাণহানির প্রায় ৩১ শতাংশ। নির্মাণ খাতের পরই সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে পরিবহন খাতে। কাজের সময় নিহত হয়েছেন ১৭০ জন পরিবহন শ্রমিক, যা মোট মৃত্যুর প্রায় ২৯ শতাংশ। অনিরাপদ কর্মস্থলের মধ্যে আরও ছিল হোটেল, ওয়ার্কশপ, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এসব সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের মোট ১১৩ জন শ্রমিক গত বছর কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। এছাড়া কল-কারখানা ও অন্যান্য উৎপাদনশীল প্রতিষ্ঠান, যেমন–গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ফ্যাক্টরি, জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ড, স্টিল অথবা রি-রোলিং কারখানায় নিহত হয়েছেন ৬৩ জন শ্রমিক। আর কৃষি শ্রমিক মারা গেছেন ৬২ জন, যাঁদের প্রায় সবার মৃত্যু হয় বজ্রাঘাতে।[২২]

নির্যাতনের অভিযোগে ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে গৃহকর্মী পাঠানো বন্ধ করে দিলে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করে সৌদি আরব। এর পর থেকে গত জুলাই পর্যন্ত প্রায় ৩ লাখ নারী কর্মী গেছেন দেশটিতে। সেখান থেকে প্রায়ই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশে ফেরেন নারী শ্রমিকরা।

প্রবাসী শ্রমিকদের পরিস্থিতি

প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ বা রেমিট্যান্স গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে। জিডিপিতে প্রবাসীদের পাঠানো বিদেশি মুদ্রার অবদান ১২ শতাংশ।[২৩] ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবাসীরা ১ হাজার ৬৪২ কোটি ডলার বা ১ লক্ষ ৪১ হাজার কোটি টাকা পাঠিয়েছেন।[২৪] এই বিপুল পরিমাণ প্রবাসী আয়ের পেছনে রয়েছে ১ কোটিরও বেশি প্রবাসী শ্রমিকের জীবন ক্ষয় করা পরিশ্রম। অথচ সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের এই খাতে সরকারের তেমন কোন বিনিয়োগ নেই। প্রবাসীদের সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে দূতাবাসগুলোর জনবল ঘাটতির কথা বলা হয় প্রায়ই। উচ্চ অভিবাসন ব্যয়ের কারণে ঋণ করে বিদেশে গিয়ে দৈনিক ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করে অতিরিক্ত চাপ, পরিশ্রম ও অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের ফলে অকালে লাশ হয়ে দেশে ফিরতে হয় এই প্রবাসী শ্রমিকদের। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী, বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১১ জন শ্রমিকের লাশ আসছে। ২০০৫ সাল থেকে ধরলে ২০১৯-এর আগস্ট পর্যন্ত ৩৯ হাজার ৭৪৯ জনের লাশ এসেছে বিদেশ থেকে। এর মধ্যে ২০১৬ সালে ৩ হাজার ৪৮১, ২০১৭ সালে ৩ হাজার ৩৮৭ এবং ২০১৮ সালে আসে ৩ হাজার ৭৯৩টি মৃতদেহ। এর মধ্যে বেশির ভাগই মারা গেছেন স্ট্রোক বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে।[২৫]

নির্যাতনের অভিযোগে ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে গৃহকর্মী পাঠানো বন্ধ করে দিলে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করে সৌদি আরব। এর পর থেকে গত জুলাই পর্যন্ত প্রায় ৩ লাখ নারী কর্মী গেছেন দেশটিতে। সেখান থেকে প্রায়ই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশে ফেরেন নারী শ্রমিকরা। জানুয়ারি ২০১৮ থেকে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত এভাবে দেশে ফিরে এসেছেন ২ হাজার ২২২ জন নারী গৃহকর্মী।[২৬]

কর্মসংস্থান

দেশে জিডিপি বাড়ছে, কিন্তু বাড়ছে না সেই অনুযায়ী কর্মসংস্থান। উল্টো বড় ও মাঝারি শিল্প-কারখানার সংখ্যা কমছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উৎপাদন শিল্প জরিপ অনুসারে ২০১২ থেকে ২০১৯ সালে বড় ও মাঝারি শিল্প-কারখানা কমেছে। আড়াই শর বেশি শ্রমিক কাজ করেন এমন বড় শিল্প-কারখানা ছয় বছরে ৩ হাজার ৬৩৯ থেকে ৬০৮টি কমে হয়েছে ৩ হাজার ৩১টি। আর এক শ থেকে আড়াই শ শ্রমিকের মাঝারি কারখানা ছয় বছরে ৬ হাজার ১০৩ থেকে ৩ হাজার ৮৯টি কমে হয়েছে ৩ হাজার ১৪টি।[২৭] আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) 'এশিয়া-প্যাসিফিক এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল আউটলুক-২০১৮' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশে তরুণদের মধ্যে বেকারত্ব ২০১০ সালের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে ২০১৭ সালে ১২.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্ব ১০.৭ শতাংশ, যা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ২৮টি দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। বাংলাদেশের ওপরে আছে কেবল পাকিস্তান।[২৮]

যত উন্নয়নের গল্পই প্রচার করা হোক না কেন, বাস্তবতা হল, কৃষি-দিনমজুরি-নির্মাণ খাত থেকে শুরু করে বিলিয়ন ডলারের গার্মেন্ট শিল্প পর্যন্ত বাংলাদেশে এমন কোন কর্মক্ষেত্র নেই, যেখানে কাজ করে খেটে খাওয়া মানুষ নিশ্চিন্তে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারে। এ অবস্থায় শ্রম বিক্রি করে ভাগ্য ফেরানো তো দূরের কথা, কোন রকমে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাটাই দায়। সারা বছর কাজ জোটে না, তার ওপর রয়েছে কর্মক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নানা দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঝুঁকি। দেশে থাকলেও যেহেতু ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা, সেই সঙ্গে মারাত্মক নিম্ন মজুরি–কাজেই তুলনামূলক বেশি মজুরি প্রাপ্তির আশায় শ্রমিকরা মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে এমনকি অবৈধ পথে দেশের বাইরে যাচ্ছেন। মরিয়া হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পথে বিদেশে পাড়ি দিতে যাওয়া বাংলাদেশের বেকার তরুণদের সাগরে ডুবে করুণ মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশিত হয়

প্রায়ই।[২৯] ২০১৫ সালে গণমাধ্যমে থাইল্যান্ডের জঙ্গলে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের অভিবাসীদের গণকবর ও বন্দিশিবির আবিষ্কৃত হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। মালয়েশিয়ার উত্তরে থাইল্যান্ডের সীমান্তঘেঁষা পাহাড়ি জঙ্গলে ২৮টি পরিত্যক্ত বন্দিশিবিরসহ ১৩৯টি গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়, যেসব গণকবরে মাটিচাপা দেয়া হয় সাগরপথে পাচারের শিকার শত শত বাংলাদেশি ও মিয়ানমারের রোহিঙ্গার লাশ।[৩০] জাতিসংঘের উদ্বাস্তুবিষয়ক হাইকমিশনের (ইউএনএইচসিআর) ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে ২০১৩ সালের জুলাই থেকে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে বঙ্গোপসাগর দিয়ে অবৈধভাবে গেছেন ৫৩ হাজার লোক। আগের বছর এই সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৩ হাজার। অভিবাসন ও মানব পাচার বিষয়ক দেশীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটিং মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট বা রামরুর হিসাবে, ২০১৪ সালে পাচারের সময় বাংলাদেশিদের মধ্যে ৫৪০ জন গভীর সমুদ্রে মারা গেছেন, নিখোঁজ হয়েছেন অনেকেই। তাঁদের মধ্যে কেবল সিরাজগঞ্জ জেলার বাসিন্দাই প্রায় ৫০০। একই জেলার ২৫০ জনের সন্ধান মিলেছে থাইল্যান্ডের বিভিন্ন কারাগারে।[৩১] ২০১৮ সালের অক্টোবরে মেক্সিকোর দুর্গম পথে যুক্তরাষ্ট্রগামী প্রায় ২০০ বাংলাদেশি আটক হন। ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারিতে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে আটক করা হয় মালয়েশিয়াগামী ১৯২ জন বাংলাদেশিকে।[৩২]

সড়ক উন্নয়ন ও সড়ক নিরাপত্তা

বাংলাদেশে সড়ক-মহাসড়ক নির্মাণকাজের একটি বৈশিষ্ট্য হল নির্মাণকাজের সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি। শুরুতে যে নির্মাণ ব্যয় নির্ধারণ করা হয় প্রায় ক্ষেত্রেই তা বেড়ে দ্বিগুণ বা তিনগুণ হয়ে যায়। এভাবে কয়েকগুণ বেশি খরচে নির্মিত রাস্তা আবার কিছুদিন পরেই ভাঙতে থাকে, যার মেরামত ও রক্ষাণাবেক্ষণের জন্যও বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়। এসব নির্মাণকাজের সাথে সংশিষ্ট দেশি-বিদেশি গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও জনগণের অর্থের বিপুল অপচয় ঘটে।

ভারত, চীন, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কার মত দেশগুলোর চেয়ে বাংলাদেশে দ্বিগুণ বা তারও বেশি ব্যয়ে ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। ফ্লাইওভার নির্মাণে কলকাতায় প্রতি কিলোমিটারে ব্যয় ৪৮ কোটি ১৫ লাখ টাকা, চীনে ৫০ কোটি টাকা, মালয়েশিয়ায় ৫৭ কোটি টাকা খরচের হিসাব পাওয়া গেলেও বাংলাদেশে খরচ হচ্ছে এর চেয়ে কয়েকগুণ।[৩৩] প্রথম ধাপে মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পের খরচ ছিল ৩৪৩ কোটি ৭০ লাখ টাকা। দ্বিতীয় ধাপে এই খরচ নির্ধারণ করা হয় ৭৭২ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। সব শেষে ৮.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়ায় ১ হাজার ২১৮ দশমিক ৮৯ কোটি টাকা।[৩৪] অর্থাৎ প্রতি কিলোমিটারে ব্যয় হয় ১৪০ কোটি টাকা। বেসরকারি ওরিয়ন গ্রুপের সাথে যৌথভাবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের ভিত্তিতে নির্মিত ১১.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারের নির্মাণ ব্যয় শুরুতে ৭৮৮ কোটি টাকা ধরা হলেও নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা হয়।[৩৫] অর্থাৎ প্রতি কিলোমিটারে খরচ হয় ২০৫ কোটি টাকা। এই অর্থ ওরিয়ন গ্রুপ ২৪ বছর ধরে টোলের মাধ্যমে মুনাফাসহ উসুল করবে।

এ তো গেল বাড়তি খরচের কথা। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে তা কি সফল হয়েছে? প্রাইভেট কার ও দূরপালার আন্ত জেলা পরিবহন টোল দিয়ে এই ফ্লাইওভার ব্যবহার করলেও নগরের অভ্যন্তরীণ পরিবহনগুলো উঁচু টোলের কারণে তা ব্যবহার করতে চায় না। ফ্লাইওভারের পিলারের কারণে নিচের রাস্তা সরু হয়ে যাওয়ায় এবং অব্যবস্থাপনা ও মেরামত না করার কারণে নিচের রাস্তায় যানজট লেগেই থাকে।[৩৬] গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ীর এই ফ্লাইওভারের কার্যকারিতা নিয়ে করা এক গবেষণা অনুসারে, "ফ্লাইওভারের ওপরের ও নিচের রাস্তায় যানবাহনগুলোকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়, বিশেষত কর্মদিবসগুলোতে এই সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। এ থেকে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, এই ফ্লাইওভার নির্মাণের ফলে অবাধ যান চলাচলে সুবিধা হওয়ার বদলে উল্টো আরও বাধা তৈরি হয়েছে।"[৩৭] যানজট কমানোর কথা বলে একের পর এক ব্যয়বহুল ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হলেও যানজট কমার বদলে উল্টো বাড়ছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতে, এক দশকে রাজধানীতে যানবাহনের গড় গতিবেগ ২১ কিলোমিটার থেকে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৬ কিলোমিটারে।[৩৮]

বিশ্বে মহাসড়ক নির্মাণ ব্যয়ে বাংলাদেশ শীর্ষস্থানে রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারের চেয়ে দেশীয় বাজারে শ্রমিকের মজুরি কম থাকলেও দেশের ভেতরেই ১১ বছরে এক্ষেত্রে নির্মাণ ব্যয় ২৫ গুণ পর্যন্ত বেড়েছে।[৩৯] ইউরোপে চার লেনের নতুন মহাসড়ক নির্মাণে কিলোমিটারপ্রতি ব্যয় পড়ছে ২৮ কোটি টাকা। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এই ব্যয় ১০ কোটি টাকা। আর চীনে তা গড়ে ১৩ কোটি টাকা। তবে বাংলাদেশের তিনটি মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করতে ব্যয় ধরা হচ্ছে কিলোমিটার প্রতি গড়ে ৫৯ কোটি টাকা।[৪০] ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা মহাসড়কের নির্মাণ ব্যয় কিলোমিটারে ঠেকেছে ১২২ কোটি ৭৭ লাখ টাকায়।[৪১]

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজের ব্যয় বেড়েছে ১ হাজার ২৭১ কোটি টাকা বা ৫৮.৬২ শতাংশ। শুরুতে প্রকল্পের ব্যয় ছিল ২ হাজার ১৬৮ কোটি টাকা। ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে তিন হাজার ৪৩৯ কোটি টাকা।[৪২] ২০০৭ সালে একনেকে ১০ হাজার ১৬১ কোটি ৭৫ লাখ টাকার পদ্মা সেতু প্রকল্প অনুমোদিত হয়। ২০১১ সালে ব্যয় বাড়িয়ে করা হয় ২০ হাজার ৫০৭ কোটি ২০ লাখ টাকা, ২০১৬ সালে তা বেড়ে ২৮ হাজার ৭৯৩ কোটি হয়ে যায়। ২০১৮ সালে বাড়তি যুক্ত হয় আরও ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা; ফলে পদ্মা সেতুর ব্যয় বেড়ে দাঁড়াল ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকায়।[৪৩]

নতুন নির্মাণ করা সড়কের বয়সসীমা গড়ে ২০ বছর। নির্মাণের প্রথম পাঁচ বছরে মেরামত করার প্রয়োজন হওয়ার কথা না। কিন্তু মানহীন নির্মাণকাজের কারণে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে দেশের সড়ক বা মহাসড়কগুলো নির্মাণের পরও তা বেশিদিন টিকছে না, বছর না ঘুরতেই নতুন নির্মিত সড়ক ভেঙেচুরে, কার্পেটিং উঠে চলাচলের

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উৎপাদন শিল্প জরিপ অনুসারে ২০১২ থেকে ২০১৯ সালে বড় ও মাঝারি শিল্প-কারখানা কমেছে। আড়াই শর বেশি শ্রমিক কাজ করেন এমন বড় শিল্প-কারখানা ছয় বছরে ৩ হাজার ৬৩৯ থেকে ৬০৮টি কমে হয়েছে ৩ হাজার ৩১টি। আর এক শ থেকে আড়াই শ শ্রমিকের মাঝারি কারখানা ছয় বছরে ৬ হাজার ১০৩ থেকে ৩ হাজার ৮৯টি কমে হয়েছে ৩ হাজার ১৪টি।

অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার দুই বছরের মধ্যেই বিভিন্ন স্থান উঁচু-নিচু হয়ে যাওয়া ও ফাটল মেরামতের জন্য প্রায় ৭৯৩ কোটি টাকার প্রকল্প নেয়া হয়।[৪৪] নিম্নমানের নির্মাণকাজের কারণে সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-টাঙ্গাইল চার লেন মহাসড়কের কিছু অংশ এমনকি উদ্বোধনের আগেই দেবে যাওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।[৪৫]

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল মহাসড়ক নির্মাণ জিডিপি বৃদ্ধিতে অবদান রাখলেও সড়ক নিরাপত্তা অর্জনে তার কোন ছাপ দেখা যাচ্ছে না। ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯-এর এপ্রিল পর্যন্ত ১০ বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় ২৫ হাজার ৫২৬ জন মারা গেছেন। এ সময় আহত হয়েছেন ১৯ হাজার ৭৬৩ জন। এই হিসাবে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিবছর দুই হাজার ৪৭১ জন মারা গেছেন। প্রতিদিন গড়ে মারা গেছেন সাতজন।[৪৬]

একদিকে অদক্ষ ও লাইসেন্সবিহীন চালক, অন্যদিকে ত্রুটিপূর্ণ বা ফিটনেসবিহীন যানবাহন–এই দুয়ে মিলে সড়ক-মহাসড়ক আরও অনিরাপদ হয়ে উঠেছে। ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী, সারা দেশে ফিটনেসবিহীন বা চলাচলের অনুপযোগী যানবাহনের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ। আর যানবাহনের তুলনায় লাইসেন্সধারী চালকের সংখ্যা নয় লাখ কম। অর্থাৎ নয় লাখ যান চালাচ্ছেন ভুয়া বা অদক্ষ চালকরা।[৪৭]

২০০৫ সালে ঢাকার তৈরি ২০ বছরের কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (এসটিপি) আর ২০১৫ সালে সংশোধিত পরিবহন পরিকল্পনায় (আরএসটিপি) নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল যানবাহন পরিচালনা নিশ্চিত করা এবং বাসসেবার উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তা বাদ দিয়ে সরকার বিপুল ব্যয়ে উড়াল সড়কের মত বড় প্রকল্পকে গুরুত্ব দিয়েছে। এভাবে ঢাকার সড়ক ও পরিবহন খাতে এক দশকে ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি প্রকল্প নেয়া হলেও রাজধানী শহরে যানবাহন চলছে হাতের ইশারায়, সংকেতবাতি প্রায় অকার্যকর, নাজুক গণপরিবহনব্যবস্থায় নগরবাসীর দুর্ভোগের অন্ত নেই। ঢাকা মানেই যানজট, সড়কে মৃত্যু, দূষণ আর বেহাল সড়কের শহর।[৪৮] আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'নামবিও'র প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ট্রাফিক ইনডেক্স-২০১৯ অনুসারে, যানজটের শহর হিসেবে বিশ্বে প্রথম স্থান অর্জন করেছে ঢাকা শহর। শুধু তা-ই নয়, সময় অপচয় ও ট্রাফিক অদক্ষতা সূচকেও শীর্ষে রয়েছে ঢাকা। এর আগে ২০১৮ ও ২০১৭ সালে যানজটে ঢাকার অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। ২০১৬ সালে ঢাকার অবস্থান ছিল তৃতীয় এবং ২০১৫ সালে ছিল অষ্টম।[৪৯]

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত

উন্নয়নের নামে গত এক দশকে দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে ক্রমশ দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর লুটপাটের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সংকটের দ্রুত সমাধানের নামে 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) বিল-২০১০' নামক কালো আইনের দায়মুক্তির ছত্রচ্ছায়ায় দেশের বিদ্যুৎ খাতে প্রথমে কুইক রেন্টাল ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং পরে ভারত-চীন-রাশিয়ার কয়লা, গ্যাস ও পারমাণবিক বিদ্যুৎ কোম্পানির প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। গ্যাস সংকটের কথা বলে স্বল্প সময়ের জন্য তেলভিত্তিক ব্যয়বহুল কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বসানো হলেও পরবর্তীতে তা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে পরিণত করা হয়েছে। বেসরকারি খাতের কুইক রেন্টাল ও রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে চড়াদামে কেনা বিদ্যুতের মূল্য পরিশোধ করতে গিয়ে পিডিবির লোকসানের পালা ভারী হয়েছে। রেন্টাল, কুইক রেন্টাল, আইপিপিসহ বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ না কিনলেও চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট হারে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হয় পিডিবিকে। ফলে বিদ্যুৎ কম উৎপাদিত হলে ইউনিটপ্রতি খরচ বেশি পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১২ সালের মার্চ মাসে ১০টি কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হয় ১১২ কোটি টাকা। খুলনা ৫৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন না হলেও ওই মাসে তাদের শোধ করা হয় ১০ লাখ ৭১ হাজার ৯০২ ডলার বা আট কোটি ৭৫ লাখ ৭৪ হাজার ৪৫১ টাকা।[৫০]

> গ্যাস অনুসন্ধানে বিদ্যমান জাতীয় সক্ষমতাটুকু কাজে না লাগিয়ে বিদেশি কোম্পানি নির্ভর তৎপরতার ফলে গ্যাস সংকটের কোন সমাধান হয়নি, গ্যাস সংকটের কথা বলে আরও নতুন সংকট তৈরি করা হয়েছে–বিদেশ থেকে ব্যয়বহুল এলএনজি আমদানি করা হয়েছে, রূপপুরে ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের জন্য বিপজ্জনক রাশিয়ার ঋণনির্ভর ব্যয়বহুল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে, সুন্দরবনের ১৪ কিলোমিটার দূরে ভারতের সাথে যৌথ উদ্যোগে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করে সুন্দরবনকে বিপদাপন্ন করা হচ্ছে, স্থানীয় জনগণের মতামত ও পরিবেশদূষণের বিপদকে উপেক্ষা করে বাঁশখালী, মহেশখালী, মাতারবাড়ী, পায়রায় চীন-জাপানের ঋণে হাজার হাজার মেগাওয়াটের কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।

দেশ এনার্জির সিদ্ধিরগঞ্জের ডিজেলচালিত ভাড়াভিত্তিক ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিদ্যুৎ কেনা হয় ১৮ কোটি ৩৭ লাখ কিলোওয়াট ঘণ্টা। ইউনিটপ্রতি দাম পড়ে ২৫ টাকা ৮৯ পয়সা। কেন্দ্রটি ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের বড় একটা সময় বন্ধ থাকায় ওই মাসে মাত্র ২৭ লাখ ২০ হাজার কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এতে ডিসেম্বরে কেন্দ্রটির ইউনিটপ্রতি বিদ্যুতের দাম পড়ে ১০০ টাকার বেশি।[৫১] সামিট গ্রুপের ১১টি বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিদ্যুৎ কেনা হয় ৫৮৪ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা। এজন্য ব্যয় করা হয় প্রায় পাঁচ হাজার ৮১ কোটি টাকা। এর মধ্যে ক্যাপাসিটি চার্জই পরিশোধ করা হয় ১ হাজার ৯৪৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিদ্যুৎ কেনায় মোট ব্যয়ের ৩৮.২৮ শতাংশই ছিল ক্যাপাসিটি চার্জ।[৫২]

২০১৭-১৮ অর্থবছরে পিডিবি ফার্নেস তেল ভিত্তিক আইপিপি ও রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে গড়ে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ যথাক্রমে ১০.৩৮ ও ১১.২০ টাকা দরে এবং ডিজেলভিত্তিক আইপিপি ও রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে যথাক্রমে ২০.৫৯ ও ২৭.৪৬ টাকা দরে ক্রয় করেছে।[৫৩] ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ১০ বছরে বিপিডিবির লোকসান হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থাটি ৯ হাজার ৩১০ কোটি টাকা নিট লোকসান করেছে।[৫৪] এর পরও এক বছরের মধ্যে উৎপাদনে আনার শর্ত দিয়ে ২০১৭ সালের

শেষের দিকে তেলভিত্তিক ১০টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এগুলোর স্থাপিত ক্ষমতা ১ হাজার ৭৬৮ মেগাওয়াট। এসব কেন্দ্রে বিদ্যুতের গড় উৎপাদন ব্যয় প্রতি ইউনিট ১৪ থেকে ২৫ টাকা।[৫৫]

বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে চড়াদামে বিদ্যুৎ কিনতে গিয়ে পিডিবি যখন দিনের পর দিন লোকসান দিচ্ছে, দেশের বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো তখন বিশ্বের অন্যতম লাভজনক কোম্পানিতে পরিণত হচ্ছে। ২০১৭ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরে (প্রথম তিন প্রান্তিকের অ্যানুয়ালাইজড হিসাব) বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর নিট মুনাফার গড় মার্জিন ছিল প্রায় ৩৩ শতাংশ। ইবিএল সিকিউরিটিজ, লঙ্কাবাংলা সিকিউরিটিজ, ইউনিক্যাপ সিকিউরিটিজ রিসার্চসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি ইকুইটি রিসার্চ টিমের সংকলিত উপাত্তে এই চিত্র উঠে আসে। কোম্পানিগুলোর প্রতিবেদন বিশ্লেষণে দেখা যায়, উৎপাদিত বিদ্যুতের ক্রেতাপক্ষ তথা সরকারের সঙ্গে চুক্তির শর্তাবলি, প্রাথমিক জ্বালানি, প্রযুক্তি ও পরিচালন পদ্ধতি, পরিচালন দক্ষতা ইত্যাদি কারণে দেশে কোম্পানিভেদে নিট মুনাফার মার্জিন সর্বনিম্ন ১২ এবং সর্বোচ্চ ৭৪ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। অথচ বিশ্বের বিদ্যুৎ খাতের কোম্পানিগুলোর নিট মুনাফার গড় মার্জিন ৮-১০ শতাংশ। প্রতিবেশী ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিদ্যুৎ উৎপাদকদের পাঁচ বছরের চিত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাষ্ট্রায়ত্ত জলবিদ্যুৎ জায়ান্ট ন্যাশনাল হাইড্রোপাওয়ার করপোরেশন ছাড়া সাধারণত কোনটিরই নিট মার্জিন ২০ শতাংশ ছাড়ায়নি। ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার করপোরেশন (এনটিপিসি), টাটা পাওয়ার, টরেন্ট পাওয়ার, আদানি পাওয়ারের মত বড় পোর্টফোলিওর কোম্পানিগুলোর নিট মার্জিনের দীর্ঘমেয়াদি গড় ১৫ শতাংশের বেশি নয়।[৫৬]

আবার একদিকে গ্যাস সংকটের সমাধানের জন্য স্থলভাগে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সের বিদ্যমান সক্ষমতা কাজে লাগানো এবং সমুদ্রের গ্যাস উত্তোলনে সক্ষমতা গড়ে তোলার বদলে স্থলভাগে গ্যাজপ্রমের মত বিদেশি কোম্পানিকে দ্বিগুণ খরচে কূপ খননের কাজ দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে সাগরের গ্যাস বকগুলো রফতানিমুখী প্রডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেয়ার তৎপরতা চালানো হয়েছে। ২০১২ সালের ২৬ এপ্রিল 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) বিল-২০১০'-এর আওতায় বিনা টেন্ডারে রাশিয়ার গ্যাজপ্রমের সাথে ১০টি কূপ খননের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। এর মধ্যে ৫টি উন্নয়ন কূপ, যার ৪টি তিতাসের এবং ১টি রশিদপুরের; বাকি ৫টি বাপেক্সের মালিকানাধীন ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কূপ। চুক্তি অনুযায়ী গ্যাজপ্রমকে ৫টি উন্নয়ন কূপের জন্য ১০.৩৩ কোটি ডলার এবং ৫টি অনুসন্ধান কূপের জন্য ৯.৩২ কোটি ডলার অর্থাৎ ১০টি কূপ খননের জন্য মোট ১৯.৩৫ কোটি ডলার বা ১৪৭০ কোটি টাকা (১ ডলার=৭৬ টাকা ধরে) দিতে হবে।[৫৭] ফলে গড়ে একেকটি কূপ খননের খরচ পড়ে ১৪৭ কোটি টাকা। অথচ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্স একেকটি কূপ খনন করতে গড়ে ৭০-৮০ কোটি টাকারও কম খরচ করে। চুক্তির সময় পেট্রোবাংলা ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রাপ্তির আশা করলেও বাস্তবে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে ১১ মাস দেরি করে গ্যাজপ্রম মাত্র ১৪৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করতে সক্ষম হয়।[৫৮] তার পরও ২০১৫ সালে ৫টি এবং ২০১৮ সালে আরও দুটি কূপ খননের চুক্তি করা হয়। এরই মধ্যে ২০১৬ সালে বাপেক্স গ্যাজপ্রম কর্তৃক খননকৃত ১০টি কূপের মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করে। এই প্রতিবেদনে ১০টি কূপের মধ্যে ৫টি বিভিন্ন কারিগরি ত্রুটির কারণে বন্ধ রয়েছে বলে উল্লেখ করে বাপেক্স। শুধু তা-ই নয়, যে ৫টি কূপ চালু রয়েছে সেগুলো থেকেও পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না, ২২৫ মিলিয়ন ঘনফুটের বদলে গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৮৭ মিলিয়ন ঘনফুট![৫৯] তার পরও ২০১৭ সালে গ্যাজপ্রমের সঙ্গে ৩৩.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ২৬৫.৫ কোটি টাকায় আরও দুটি কূপ খননের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে গ্যাজপ্রমকে যে কোন দুর্ঘটনা থেকে দায়মুক্তি দেয়া হয়।[৬০]

বাংলাদেশের সমুদ্রে গ্যাস প্রাপ্তির ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্যাস উত্তোলনের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এখন পর্যন্ত যা উদ্যোগ তার সবই বিদেশি কোম্পানির সাথে জাতীয় স্বার্থবিরোধী পিএসসি চুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মডেল পিএসসি ২০০৮ অনুসারে ২০১১ সালে কনোকো-ফিলিপসের সাথে সাগরের ২টি বকে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য রফতানিমুখী পিএসসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কনোকো-ফিলিপস এই বকগুলোতে প্রাথমিক ভূকম্পন জরিপ সম্পন্ন করে। তারা কোন অনুসন্ধান কূপ খনন না করেই ২০১৪ সালে ব্লকগুলো ছেড়ে দেয়। মডেল পিএসসি ২০১২ অনুসারে ২০১৪ সালে অগভীর সমুদ্রের ৪ ও ৯ নম্বর বকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে ভারতীয় কোম্পানি ওএনজিসি বিদেশ লিমিটেডের (ওভিএল) সঙ্গে এবং ১১ নম্বর ব্লকের জন্য সান্টোস ও ক্রিস এনার্জির সাথে উৎপাদন অংশীদারি চুক্তি (পিএসসি) সই করেছে পেট্রোবাংলা।[৬১] এরপর 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) বিল-২০১০' আইনের আওতায় কোন ধরনের বিডিং ছাড়াই বক-১২-তে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য দাইয়ু করপোরেশনের সঙ্গে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে গ্যাস রফতানির সুযোগ রেখে উৎপাদন বণ্টন চুক্তি (পিএসসি) সই করে পেট্রোবাংলা।[৬২] মডেল পিএসসি ২০০৮-এর মাধ্যমে মার্কিন বহুজাতিক কনোকো-ফিলিপসের হাতে গ্যাস রফতানির সুযোগ রেখে সাগরের দুটি গ্যাস ব্লক তুলে দেয়ার চুক্তির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে তার ফলাফলস্বরূপ মডেল পিএসসি ২০১২ থেকে গ্যাস রফতানির বিধানটি বাদ দেয়া হয়েছিল। সম্প্রতি সরকার আবার গভীর সমুদ্রের গ্যাস রপ্তানির বিধানসহ বিদেশি কোম্পানির জন্য নানা বাড়তি সুবিধা দিয়ে মডেল পিএসসি ২০১৯ তৈরি করেছে।[৬৩]

এভাবে গ্যাস অনুসন্ধানে বিদ্যমান জাতীয় সক্ষমতাটুকু কাজে না লাগিয়ে বিদেশি কোম্পানি নির্ভর তৎপরতার ফলে গ্যাস সংকটের কোন সমাধান হয়নি, গ্যাস সংকটের কথা বলে আরও নতুন সংকট তৈরি করা হয়েছে–বিদেশ থেকে ব্যয়বহুল এলএনজি আমদানি করা হয়েছে, রূপপুরে ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের জন্য বিপজ্জনক রাশিয়ার ঋণনির্ভর ব্যয়বহুল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে, সুন্দরবনের ১৪ কিলোমিটার দূরে ভারতের সাথে যৌথ উদ্যোগে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করে সুন্দরবনকে বিপদাপন্ন করা হচ্ছে, স্থানীয় জনগণের মতামত ও পরিবেশদূষণের বিপদকে উপেক্ষা করে বাঁশখালী, মহেশখালী, মাতারবাড়ী, পায়রায় চীন-জাপানের ঋণে হাজার হাজার মেগাওয়াটের কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। রূপপুরের ২৪০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য বাংলাদেশ রাশিয়ার কাছ থেকে ১১.৩৮ বিলিয়ন ডলার (১ হাজার ১৩৮ কোটি ডলার বা ৯৬ হাজার ৭৩০ কোটি টাকা, প্রতি ডলার ৮৫ টাকা হিসাবে) ঋণ নিচ্ছে[৬৪] যার জন্য বাংলাদেশকে সুদে-আসলে কমপক্ষে ১৮.২৩ বিলিয়ন ডলার

পরিশোধ করতে হবে।[৬৫] কয়লা লোড-আনলোডের জন্য বন্দরসহ মাতারবাড়ী ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের মোট খরচ ৩৫ হাজার ৯৮৪ কোটি টাকা, যার মধ্যে ২৮ হাজার ৯৩৯ কোটি টাকা জাইকার কাছ থেকে ঋণ নেয়া হবে।[৬৬] ১৩২০ মেগাওয়াট পায়রা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১২ হাজার ২৮৪ কোটি টাকা। মোট ব্যয়ের ৮০ শতাংশ ঋণ দেবে চীনের এক্সিম ব্যাংক ও চায়না ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক।[৬৭] ১৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের ১৩২০ মেগাওয়াট রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ভারতের এক্সিম ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেয়া হচ্ছে ১৬০ কোটি মার্কিন ডলার বা ১৩ হাজার কোটি টাকা।[৬৮] এসব উদ্যোগের ফলে একদিকে দেশের অর্থনীতি ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে, অন্যদিকে দেশের পরিবেশ-প্রতিবেশ ধ্বংসের মুখে পড়েছে।

এভাবে দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দেশি-বিদেশি কোম্পানির অংশীদারত্ব বৃদ্ধির ফলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির খরচ বেড়েছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পিডিবির লোকসান বেড়েছে, দেশি-বিদেশি কোম্পানির মুনাফা নিশ্চিত করতে জনগণের অর্থে ভর্তুকি বেড়েছে এবং দফায় দফায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০০৮ সালের ১ অক্টোবর প্রথম পাইকারি (পিডিবির ক্রেতা সংস্থাগুলো) পর্যায়ে বিদ্যুতের ১৬ শতাংশ দাম বাড়ানো হয়। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) আওতাধীন গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ২০০৯ সালের নভেম্বরে ৬.৫৭ শতাংশ দাম বাড়ানো হয়। এরপর ২০১০ সালের মার্চে খুচরা গ্রাহকদের জন্য গড়ে ৬ থেকে ৭ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। আবাসিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ১০০ ইউনিট পর্যন্ত ব্যবহারকারী গ্রাহকদের প্রতি ইউনিটের দাম ২ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ২ টাকা ৬০ পয়সা, ১০১ থেকে ৪০০ ইউনিট পর্যন্ত ৩ টাকা ১৫ পয়সা থেকে ৩ টাকা ৩০ পয়সা, ৪০০ ইউনিটের বেশি ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটের দাম ৫ টাকা ২৫ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৫ টাকা ৬৫ পয়সা করা হয়। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটের সাধারণ দাম (ফ্ল্যাট রেট) ৪ টাকা ২ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৪ টাকা ৩৫ পয়সা এবং বাণিজ্যিক গ্রাহকের ক্ষেত্রে ৫ টাকা ২০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৫ টাকা ৫৮ পয়সা করা হয়।[৬৯]

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১০ সালের ১ মার্চ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে সাত বছরে খুচরা গ্রাহক বা ভোক্তা পর্যায়ে আটবার এবং পাইকারি পর্যায়ে ছয়বার বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়।[৭০] ২০১৭ সালের মূল্যবৃদ্ধির সময় আবাসিক খাতে প্রথম ধাপে ০ থেকে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের দাম ইউনিটপ্রতি ৩ টাকা ৮০ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৪ টাকা, দ্বিতীয় ধাপে ৭৬ থেকে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত ইউনিটপ্রতি ৫ টাকা ১৪ পয়সা থেকে ৫ টাকা ৪৫ পয়সা, তৃতীয় ধাপে ২০১ থেকে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত ৫ টাকা ৩৬ পয়সা থেকে ৫ টাকা ৭০ পয়সা, চতুর্থ ধাপে ৩০১ থেকে ৪০০ ইউনিট পর্যন্ত ৫ টাকা ৬৩ পয়সা থেকে ৬ টাকা ২ পয়সা, পঞ্চম ধাপে ৪০১ থেকে ৬০০ ইউনিট পর্যন্ত ৮ টাকা ৭০ পয়সা থেকে ৯ টাকা ৩০ পয়সা এবং ষষ্ঠ ধাপে ৬০০ ইউনিটের বেশি ব্যবহারকারীদের ইউনিটপ্রতি দাম ৯ টাকা ৯৮ পয়সা থেকে ১০ টাকা ৭০ পয়সা করা হয়। ক্ষুদ্র শিল্পে ফ্ল্যাট রেট (সবকিছু মিলে মোট মূল্য) ইউনিটপ্রতি ৭ টাকা ৬৬ পয়সা থেকে ৮ টাকা ২০ পয়সা এবং বাণিজ্যিক গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাট রেট ইউনিটপ্রতি ৯ টাকা ৮০ পয়সা থেকে ১০ টাকা ৩০ পয়সা করা হয়।[৭১] লক্ষণীয় বিষয় হল, এই সময়ে আবাসিক খাতে বিদ্যুতের সর্বনিম্ন মূল্য ২ টাকা ৫০ পয়সা থেকে বেড়ে ৪ টাকা এবং সর্বোচ্চ মূল্য ৫ টাকা ২৫ পয়সা থেকে ১০ টাকা ৭০ পয়সা হয়েছে, ক্ষুদ্র শিল্পে প্রতি ইউনিট ৪ টাকা ২ পয়সা থেকে ৮ টাকা ২০ পয়সা এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ৫ টাকা ২০ পয়সা থেকে ১০ টাকা ৩০ পয়সা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে গ্যাসের দাম বাড়ায়। এর আগে গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়েছিল ২০০৫ সালে। এরপর ২০১৫, ২০১৭ ও ২০১৯ সালে আরও তিন দফা গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়, যার ফলে ২০০৯ সালের তুলনায় বর্তমানে গ্যাসের দাম দ্বিগুণেরও বেশি।

টেবিল : গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির পরিসংখ্যান[৭২]

গ্রাহক শ্রেণি	মূল্যহার (টাকা/ঘনমিটার)					মূল্যবৃদ্ধির হার
	২০০৫*	২০০৯	২০১৫	২০১৭	২০১৯	
বিদ্যুৎ	২.৬১	২.৮২	২.৮২	২.৯৯	৪.৪৫	৭০.৫১
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৩.৭৩	৪.১৮	৮.৩৬	৮.৯৮	১৩.৮৫	২৭১.৪৭
সার	২.২৪	২.৫৮	২.৫৮	২.৬৪	৪.৪৫	৯৮.৭৪
শিল্প	৫.২৩	৫.৮৬	৬.৭৪	৭.২৪	১০.৭	১০৪.৫৭
চা বাগান	৫.২৩	৫.৮৬	৬.৪৫	৬.৯৩	১০.৭	১০৪.৫৭
বাণিজ্যিক	৮.২৩	৯.৪৭	১১.৩৬	১৪.২	১৭.০৪	১০৭.০১
সিএনজি	৩০	৩০	৩৫	৩৮	৪৩	৪৩.৩৩
গৃহস্থালি						
মিটারভিত্তিক	৪.৫৯	৫.১৬	৭	৯.১	১২.৬	১৭৪.৪৯
১ চুলা	৩৫০	৪০০	৬০০	৭৫০	৯২৫	১৬৪.২৯
২ চুলা	৪০০	৪৫০	৬৫০	৮০০	৯৭৫	১৪৩.৭৫

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত

গত এক দশকে স্বাস্থ্য খাতে বাণিজিকীকরণ বেড়েছে, বেসরকারি বাণিজ্যিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ওপর মানুষের নির্ভরতা বেড়েছে, চিকিৎসার জন্য ব্যক্তিগত খরচের অংশ বেড়েছে, চিকিৎসার প্রয়োজনে মানুষের দেশের বাইরে যাওয়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে চিকিৎসক, নার্সসহ প্রশিক্ষিত জনবলের ব্যাপক সংকট রয়েছে, বিদ্যমান জনবলের বেশির ভাগ আবার নগরকেন্দ্রিক, যদিও বেশির ভাগ মানুষের বসবাস এখনও গ্রামে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশে প্রতি ১০ হাজার মানুষের জন্য চিকিৎসকের সংখ্যা ৫.২৭, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন, বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে আছে কেবল ভুটান (৩.৭২)। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে প্রতি ১০ হাজার মানুষের জন্য চিকিৎসকের সংখ্যা মালদ্বীপে ১০.৩৮, পাকিস্তানে ৯.৭৫, শ্রীলঙ্কায় ৯.৫৮, মিয়ানমারে ৮.৬৪, ভারতে ৭.৭৮ এবং নেপালে ৬.৫১। বাংলাদেশে প্রতি ১০ হাজার মানুষের জন্য নার্স ও ধাত্রীর সংখ্যা ৩.০৭, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন। প্রতি ১০ হাজার মানুষের জন্য নার্স ও ধাত্রীর সংখ্যা মালদ্বীপে ৩৯.৫০, নেপালে ২৬.৮৫, শ্রীলঙ্কায় ২১.১৬, ভারতে ২১.০৭, ভুটানে ১৫.০৯,

মিয়ানমারে ৯.৭৯ এবং পাকিস্তানে ৫.০।[৭৩] ওয়ার্ল্ড হেলথ রিপোর্ট ২০০৬ অনুসারে চিকিৎসক, নার্স ও ধাত্রী মিলে স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা হওয়া উচিত প্রতি ১০ হাজার মানুষের জন্য অন্তত ২২.৮ এবং গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজি অন এইচআরএইচ-২০১৬ অনুসারে ৪৪.৫। ২০১৮ সালের তথ্য অনুসারে, গোটা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যকর্মীর হার সবচেয়ে কম, প্রতি ১০ হাজারে মাত্র ৮.৪৫, যা ২০১৬ সালের ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ১৯ শতাংশ।[৭৪]

স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের যেসব সাফল্যের কথা বলা হয় তার পেছনে সরকারের ভূমিকা কতটুকু আর কতটুকু সাধারণ মানুষের গাঁটের পয়সা খরচ করে অর্জিত তা বোঝার জন্য সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসক ও হাসপাতালের অনুপাত এবং চিকিৎসা ব্যয়ে ব্যক্তিগত ব্যয়ের অংশ খতিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রকাশিত হেলথ বুলেটিন-২০১৮ অনুসারে, বাংলাদেশে প্রতি ১০ হাজার মানুষের জন্য চিকিৎসকের সংখ্যা ৬.৩৩, যার মধ্যে মাত্র ১.২৮ জন সরকারি চিকিৎসক। সরকারি হাসপাতালে প্রতি ১০ হাজার মানুষের জন্য বেডের সংখ্যা ৩.২৪ হলেও বেসরকারি হাসপাতালে বেডের অনুপাত ৫.৫৭।[৭৫] বাংলাদেশে প্রতি ১০ হাজার মানুষের জন্য হাসপাতালের বেডের সংখ্যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার লক্ষ্যমাত্রার (১৮) তুলনায় অনেক কম (৮.৮১), কিন্তু যা আছে তা-ও আবার শহরকেন্দ্রিক এবং বেসরকারি হাসপাতাল কেন্দ্রিক, ফলে ব্যয়বহুল। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে, সারাদেশে হাসপাতালের সংখ্যা মোট ৫ হাজার ৬৬৬, যার মধ্যে সরকারি হাসপাতাল ৬১২টি এবং বেসরকারি হাসপাতাল ৫ হাজার ৫৪টি। সারাদেশে হাসপাতাল বেডের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩৯৪, যার মধ্যে সরকারি হাসপাতালে ৫২ হাজার ৮০৭টি এবং বেসরকারি হাসপাতালে রয়েছে ৯০ হাজার ৫৮৭টি।[৭৬]

এভাবে চিকিৎসাব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণের ফলে চিকিৎসা খরচ বাড়ছে, চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে গিয়ে মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৮ সালের এক রিপোর্ট অনুসারে, বাংলাদেশের মানুষকে চিকিৎসা খরচের ৭২ শতাংশ নিজের পকেট থেকে খরচ করতে হয়, যে খরচ করতে গিয়ে প্রতিবছর ৩.৪ শতাংশ বা ৫২ লক্ষ ৩৪ হাজার মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যায়।[৭৭] অথচ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে মালদ্বীপের মানুষকে নিজের পকেট থেকে খরচ করতে হয় মোট চিকিৎসা ব্যয়ের ১৯ শতাংশ, ভুটানে এই হার ২০ শতাংশ, শ্রীলঙ্কায় ৫০ শতাংশ, নেপালে ৫৫ শতাংশ, ভারত ও পাকিস্তানে ৬৫ শতাংশ।[৭৮] বিপুল ব্যয় করেও দেশে চিকিৎসার মান সন্তোষজনক নয়; ফলে দেশের বাইরে বিশেষত পার্শ্ববর্তী ভারতে চিকিৎসা গ্রহণের সংখ্যা বাড়ছে। আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়াংয়ের (ইওয়াই) এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৭ সালে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ভারতে যাওয়া মোট বিদেশি রোগীর ৪৫ শতাংশ বাংলাদেশি। ২০১৫-১৬ সালে এই হার ছিল ৩৫ শতাংশ।[৭৯]

২০১৮ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘের ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিকের (এসকাপ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরিপ অনুসারে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সবচেয়ে কম ব্যয় করে বাংলাদেশ। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অনুপাতে এ দুটি খাতে বাংলাদেশের ব্যয় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন। এমনকি প্রতিবেশী ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তানও বাংলাদেশের চেয়ে বেশি ব্যয় করে। এসকাপের প্রতিবেদনটি থেকে দেখা যায়, শিক্ষা খাতে বাংলাদেশ জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ ব্যয় করে। বাংলাদেশের চেয়ে কম ব্যয় করে শুধু কম্বোডিয়া। পাকিস্তানে শিক্ষা খাতে ব্যয় জিডিপির ২.৬ শতাংশ। ভারতে তা ৩.৮ শতাংশ।[৮০]

গত এক দশকে স্বাস্থ্য খাতের মত শিক্ষা খাতেরও ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেছে, শিক্ষা ব্যয়বহুল হয়েছে, শিক্ষার মান কমেছে, ভর্তি পরীক্ষাসহ সকল ধরনের পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে, দুর্নীতি ও অনিয়ম বেড়েছে। শিক্ষানীতি-২০১০ এবং বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক প্রণীত উচ্চশিক্ষার কৌশলপত্র ২০০৬-২০২৬ এর আলোকে, বিশেষত উচ্চশিক্ষা খাতে বাণিজ্যিকীকরণ তীব্র হয়েছে, যার ফলে উচ্চশিক্ষা ক্রমশ সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ব্যানবেইস কর্তৃক প্রকাশিত ২০১৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের সংখ্যা মোট ২০ হাজার ৪৬৫, যার মধ্যে ১৯ হাজার ৮০২টি (৯৬.৭৬ শতাংশ) বেসরকারি। ৪ হাজার ৪৯৫টি কলেজের মধ্যে ৩ হাজার ৮২২ বা ৮৫ শতাংশ বেসরকারি। দেশে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪৬, যার মধ্যে সরকারি ৪৩টি, বেসরকারি ১০৩টি। মোট ১১১টি মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে সরকারি ৩৭টি, বেসরকারি ৭৪। ৩৫টি ডেন্টাল কলেজের মধ্যে সরকারি ৯টি, বেসরকারি ২৬টি।[৮১] বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রায় অর্ধেকই অনুমোদন পেয়েছে গত ১০ বছরে আওয়ামী লীগের শাসনামলে। আর সেগুলোর অর্ধেকের মালিকানা ও পরিচালনায় আছেন শাসকদল বা জোটের মন্ত্রী-সাংসদ-নেতা এবং সরকার সমর্থক ছাত্র ও শিক্ষক নেতারা।[৮২] বেসরকারি মেডিক্যালের মধ্যে মোট ৩৬টির মালিকানা বা পরিচালনায় আছেন সরকারি দলের নেতা অথবা দল সমর্থিত চিকিৎসক বা ব্যবসায়ী।[৮৩]

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার তুলনায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন স্কুল, এনজিও স্কুল ইত্যাদির চেয়ে তুলনামূলক বেশি হলেও (৭২ শতাংশ[৮৪]) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান, শিক্ষকের মান ও সংখ্যা, শিক্ষার উপকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। প্রাথমিকে ভর্তির হার (Net Enrolment Ratio (NER)) ৯৮ শতাংশ হলেও মাধ্যমিকে ভর্তির হার মাত্র ৬৭.৮৪ শতাংশ। মাধ্যমিকে ঝরে পরে ৩৮.৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী। উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির হার ৩৬.৫১ শতাংশ, যেখান থেকে ঝরে পড়ে ২০.০৮ শতাংশ।[৮৫] ফলে তিন ভাগের এক ভাগ শিক্ষার্থীও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে না। ইউনেস্কোর রিপোর্ট অনুসারে, বাংলাদেশে অতিদরিদ্র পরিবারের ছেলেদের ৫৭ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করলেও মাধ্যমিকে এসে তা ধরে রাখতে পারে না। এসব পরিবারের ৯৬ শতাংশ শিক্ষার্থীই মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোনোর আগে ঝরে পড়ছে। মেয়েদের মধ্যে এই হার আরও বেশি। অতিদরিদ্র পরিবারের ৬৮ শতাংশ মেয়ে প্রাথমিক পেরোতে পারলেও মাধ্যমিক শেষ করার আগেই ঝরে পড়ছে এদের ৯৭ শতাংশ।[৮৬]

নিরাপদ খাদ্য ও পানি

প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের পরিসংখ্যান বিশুদ্ধ পানি কিংবা নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। খাল-বিল-নদী দখল ও দূষণ, রাসায়নিক ও কীটনাশকের অবাধ ব্যবহার, নদীর উজানে প্রতিবেশী ভারতের বাঁধ নির্মাণের ফলে মরুকরণ ও উপকূলের লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে দেশে নিরাপদ পানির উৎস সংকুচিত হয়েছে, সারফেস ওয়াটারের

বদলে মাটির নিচের পানির ওপর বিপজ্জনক নির্ভরতা বেড়েছে, নিরাপদ পানির সংকটকে কাজে লাগিয়ে পানির বাণিজ্যিকীকরণ বেড়েছে, যার ফলে চড়ামূল্যে বোতল কিংবা জারের পানি কিনে খাওয়া এখন স্বাভাবিক বাস্তবতা। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুসারে, দেশের প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ অপরিচ্ছন্ন ও অনিরাপদ উৎসের পানি পান করছে। দেশের পানীয় জলের নিরাপদ উৎসগুলোতে ব্যাকটেরিয়া ও আর্সেনিকের ভয়ংকর মাত্রায় উপস্থিতি রয়েছে। এসব উৎসের ৪১ শতাংশে ই-কোলাই এবং ১৩ শতাংশে রয়েছে আর্সেনিক। পাইপের মাধ্যমে নগরাঞ্চলে যে পানি সরবরাহ করা হয়, তাকে নিরাপদ মনে করা হলেও বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে, পাইপলাইনের পানির ৮২ শতাংশেই রয়েছে ক্ষতিকর ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া।[৮৭] প্রতিবছর বাজেটের আকার বাড়লেও পানি ও স্যানিটেশন খাতে বরাদ্দ সেই তুলনায় বাড়ে না। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাজেটের বরাদ্দ বিশেষণ থেকে দেখা যায় এই ৯ অর্থবছরে জিডিপির আকার আড়াই গুণের মত বাড়লেও পানি ও স্যানিটেশন খাতে বরাদ্দ মাত্র ৫৬ শতাংশ বেড়েছে। আবার বাজেটে যে বরাদ্দ দেয়া হয় সেখানেও রয়েছে আঞ্চলিক বৈষম্য, পানি ও স্যানিটেশন খাতে বরাদ্দের ৬০ শতাংশের বেশি চলে যায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী নগরের চার ওয়াসায়। ছোট শহর ও গ্রামে থাকা মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ মানুষের জন্য বরাদ্দ ২০ শতাংশেরও কম। ফলে পার্বত্য অঞ্চল, চর অঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে বেশির ভাগ মানুষ নিরাপদ পানি পায় না।[৮৮]

উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততার কারণে খুলনার ২২ শতাংশ, সাতক্ষীরার ১৩ শতাংশ এবং বাগেরহাটের ১৫ শতাংশ মানুষ নিরাপদ পানি পায় না। খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার কমপক্ষে নয়টি উপজেলার উপকূলজুড়ে বহু গ্রামে পানীয় জলের সংকট রয়েছে। সুন্দরবনসংলগ্ন জনপদে ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় আইলায় লোনা পানির তোড়ে বহু পুকুর ভেসে যায়, ১০ বছরেও যার বেশির ভাগের সংস্কার হয়নি। ফলে তাদেরকে পুকুরের পানি কিনে খেতে হয়। ঢাকা ওয়াসার এক লিটার পানির দাম ০.০১২ টাকা হলেও উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষকে ১ টাকা লিটার দরে পুকুরের পানি কিনে খেতে হয়।[৮৯] পার্বত্য অঞ্চলেও বেশির ভাগ মানুষ নিরাপদ পানি পায় না, তাদের ভরসা ছড়া ও ছড়ার পারের কুয়ার পানি। বর্ষার সময় বৃষ্টির পানি ধরে রাখা গেলেও শুষ্ক মৌসুম এলে বেড়ে যায় পানির ভোগান্তি। স্থানীয় ব্যক্তিদের পানির জন্য দূরদূরান্তে যেতে হয়। বিশেষ করে ছড়া-ঝিরি যখন শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে যায়, তখন এলাকাবাসী মাইলের পর মাইল হেঁটে পানি সংগ্রহ করে থাকে।[৯০]

নগরের পানি ব্যবস্থাপনার জন্য বরাদ্দটুকুর সুফল যে সাধারণ মানুষ পাচ্ছে তা-ও না। খোদ রাজধানীর বেশির ভাগ মানুষ পাইপলাইনের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পানি পায় না, আবার যেটুকু পায় সেটাও খাওয়ার জন্য নিরাপদ নয়। ঢাকা ওয়াসার পানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে টিআইবির গবেষণা থেকে দেখা যায়, ঢাকা ওয়াসায় টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পানির উৎপাদন ব্যবস্থায় যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে ভূ-উপরস্থ পানি ও ভূগর্ভস্থ পানির অনুপাত ৭০ঃ৩০ করার লক্ষ্য থাকলেও বর্তমান অনুপাত ২২ঃ৭৮। বৃষ্টির পানি ধারণসহ ভূ-উপরস্থ পানির উৎস বৃদ্ধির পরিবর্তে অপরিকল্পিতভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের জন্য পাম্প স্থাপনের চর্চা চলমান রয়েছে। এক্ষেত্রে গত ১০ বছরে পাম্পের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে–২০০৯ সালে পাম্প ছিল ৪৮২টি এবং ২০১৮ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৯০০টিতে। অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে পানির স্তর প্রতিবছর ২ থেকে ৩ মিটার নিচে নেমে যাচ্ছে। এছাড়া অধিক মাত্রায় পানি উত্তোলনের ফলে ঢাকার আশপাশের এলাকার পানি ধারক স্তর (অ্যাকুইফার) ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ঢাকা ওয়াসার চার ধরনের সংযোগের মধ্যে শুধু আবাসিক ব্যবহারে প্রতিদিন ন্যূনতম পানির চাহিদা ২৫৮ কোটি লিটার হলেও ঢাকা ওয়াসার দাবি অনুযায়ী উৎপাদন সক্ষমতা ২৪০ কোটি লিটার। সার্বিকভাবে ওয়াসার সেবাগ্রহীতাদের ৪৪.৮ শতাংশ চাহিদা অনুযায়ী পানি পায় না। সংযোগের ধরনভেদে গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী পানি না পাওয়ার হার সবচেয়ে বেশি বস্তি এলাকায়, যা ৭১.৯ শতাংশ। অপরদিকে আবাসিকের ৪৫.৮ শতাংশ, বাণিজ্যিকের ৩৪.৯ শতাংশ এবং শিল্পের ১৯.০ শতাংশ সেবাগ্রহীতা তাদের চাহিদা অনুযায়ী পানি পায় না। পানির নিম্নমানের কারণে সেবাগ্রহীতাদের ৯৩.০ শতাংশ বিভিন্ন পদ্ধতিতে পানি পানের উপযোগী করে। তাদের মধ্যে ৯১.০ শতাংশ ফুটিয়ে বা সিদ্ধ করে পান করে। গৃহস্থালি পর্যায়ে পানি ফুটিয়ে পানের উপযোগী করতে ঢাকা মহানগরীর খানাসমূহের গ্যাস খরচ প্রায় ৩৬ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮ ঘনমিটার, যার আর্থিক মূল্য ৩৩২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬২০ টাকা (প্রায়)। আবার পানির গুণগত মান খারাপ হওয়ার কারণে পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে। জরিপের অন্তর্ভুক্ত সেবাগ্রহীতাদের তথ্য অনুযায়ী, ওয়াসার পানি ব্যবহারের কারণে (জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৮) সেবাগ্রহীতা বা তার পরিবারের (আবাসিক ও এলআইসি) ২৪.৬ শতাংশ সদস্য পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে। পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আক্রান্ত সেবাগ্রহীতাদের ৬৩ শতাংশ ডায়রিয়া, ৩৪.৩ শতাংশ জন্ডিস, ৩৭.৪ শতাংশ চর্মরোগ, ১৭.১ শতাংশ আমাশয়, ১৯.২ শতাংশ টাইফয়েড, ১৩.১ শতাংশ কলেরা এবং ৩.৭ শতাংশ অন্যান্য ধরনের পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়েছে।[৯১]

ঢাকা ওয়াসা চাহিদা অনুযায়ী নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে না পারলেও, ওয়াসার পানিতে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও মলের জীবাণু পাওয়া গেলেও[৯২] পানির দাম বাড়িয়ে চলছে নিয়মিতভাবে। ১৯৮২ সালে আবাসিক গ্রাহকদের ১ হাজার লিটার পানির জন্য দিতে হত ১ টাকা ১০ পয়সা। ২০১০ সালে পানির দাম বাড়িয়ে করা হয় ৬ টাকা ৩৪ পয়সা, ২০১৮ সালে ১১ টাকা ২ পয়সা এবং ২০১৯-এ ১১ টাকা ৫৭ পয়সা।[৯৩]

শুধু পানিই না, উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে শাক-সবজি, ফলমূল, মাছ-মাংস-ডিম-দুধ–সবকিছুই বিষাক্ত হয়ে উঠছে। বছরে দু-একবার রেস্টুরেন্ট, বেকারি কিংবা সুপারশপে অভিযান চালিয়ে নোংরা-অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাদ্য তৈরি, খাদ্যে ভেজাল মেশানো কিংবা মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যদ্রব্য বিক্রির জন্য জরিমানা করা হলেও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, বিতরণ ও বিপণন নিশ্চিত করার জন্য কোন টেকসই কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন না থাকায় খাদ্যে ভেজাল ও বিষ এখন বাংলাদেশের নিয়মিত বাস্তবতা। ট্যানারির বিষাক্ত বর্জ্য ব্যবহার করে তৈরি ফিডমিল দিয়ে বড় করা মুরগি কিংবা মাছ, কীটনাশক ব্যবহার করে ফলানো শাক-সবজি ও ফলমূল, হরমোন-ইথোফেন-কার্বাইড দিয়ে পাকানো ফল, কৃত্রিম রং-ইট-কাঠের গুঁড়া মেশানো মসলা কিংবা কাপড়ের রং মেশানো রঙিন খাদ্য ও পানীয় আমাদের নিয়মিত খাদ্যতালিকায়। বাজারে প্রচলিত ১৪টি ব্যান্ডের দুধ পরীক্ষা করে তার ১১টিতেই অতিরিক্ত মাত্রায় সিসার উপস্থিতি পেয়েছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। এছাড়া

কয়েকটি ব্র্যান্ডের দুধে বিষাক্ত ক্যাডমিয়ামও শনাক্ত হয়েছে।[৯৪] বাজারে প্রচলিত সাতটি পাস্তুরিত দুধে মানব চিকিৎসায় ব্যবহৃত ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতি পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার ও ফার্মেসি অনুষদের গবেষকরা।[৯৫] জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরির উদ্যোগে গত বছর দেশে পরিচালিত এক গবেষণায় চালে মারাত্মক ক্ষতিকর ভারী ধাতুর উপস্থিতি শনাক্ত হয়েছে। এতে চালের ২৩২টি নমুনার মধ্যে ১৩১টিতে বিভিন্ন মাত্রায় মানুষের জন্য বিপজ্জনক ক্রোমিয়াম, ১৩০টিতে ক্যাডমিয়াম, সমসংখ্যক নমুনায় সিসা, ৮৩টিতে আর্সেনিকের অস্তিত্ব মিলেছে। এছাড়া ২০টি নমুনার মধ্যে তিনটিতে পাওয়া যায় আফলাটক্সিন।[৯৬]

পরিবেশ

বাংলাদেশের চলমান প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তা নিম্ন মজুরি ও উচ্চ পরিবেশদূষণের ওপর ভিত্তি করে ঘটছে। এদেশের শ্রমিকদের শ্রম যেমন সস্তা, পরিবেশও তেমন সস্তা, খেয়ালখুশিমত শ্রম ও পরিবেশ শোষণ করা যায়, যার ফলাফল হিসেবে ভয়াবহ দূষণের শিকার হচ্ছে এদেশের পরিবেশ। কল-কারখানার বর্জ্য দূষণে রাজধানী ঢাকার চারপাশের বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদী দূষণে মৃতপ্রায়। পরিবেশ অধিদপ্তরের ২০১১ সালের জরিপ অনুযায়ী, বুড়িগঙ্গার পার ও নিকটবর্তী প্রায় ২ হাজার, শীতলক্ষ্যার সাড়ে ৭০০ এবং তুরাগ ও বালু নদের আশপাশের এলাকার ছয় শরও বেশি কল-কারখানার বর্জ্য সরাসরি যাচ্ছে এসব নদীতে।[৯৭] বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষের ২০১৬ সালের রিপোর্ট অনুসারে প্রতিদিন শুধুমাত্র বুড়িগঙ্গাতেই ফেলা হয় ৯০ হাজার ঘনমিটার অপরিশোধিত তরল শিল্পবর্জ্য। শিল্প-কারখানাগুলোয় বর্জ্য শোধনাগার না থাকা এবং কিছু কারখানায় থাকলেও তার ব্যবহার না হওয়ায় এমনটি ঘটছে। প্রতি ঘনমিটার তরল বর্জ্য পরিশোধন করতে ৩০ টাকা করে প্রয়োজন হয় বলে মূলত পরিশোধন ব্যয় সাশ্রয় করতে বছরের পর বছর এসব অপরিশোধিত বর্জ্য ফেলা হচ্ছে নদীতে।[৯৮] কনজার্ভ এনার্জি ফিউচারের ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত ১১ নদীর তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে ঢাকার বুড়িগঙ্গা।[৯৯]

দূষিত উন্নয়নের উদাহরণ হিসেবে ঢাকার গাজীপুর কিংবা সিলেটের হবিগঞ্জের দিকে তাকানো যেতে পারে। গত এক দশকে গাজীপুরে বহু শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে, কিন্তু তার জন্য ধ্বংস করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ বনভূমি ও জলাভূমি। গাজীপুরে ভূমির ব্যবহারের পরিবর্তন নিয়ে করা একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত গাজীপুরে 'বিল্টআপ এরিয়া' (ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামোর জন্য ব্যবহার করা জমি) বৃদ্ধির হার ছিল প্রায় ৬৫.৪ শতাংশ। এ সময়ে বনভূমি কমেছে প্রায় ৬২ শতাংশ এবং জলাভূমি কমেছে প্রায় ৫৪ শতাংশ। দেশের মোট পণ্য রপ্তানি আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আসে গাজীপুরের পোশাক, সিমেন্ট, রড, স্টিল, ইলেকট্রনিক কারখানা থেকে। গাজীপুরে যেসব শিল্প-কারখানা রয়েছে, তার মধ্যে ৪৮০টি কারখানা থেকে ক্ষতিকর তরল বর্জ্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু এর মধ্যে ৩৫টি কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার বা ইটিপি স্থাপনই করা হয়নি। আবার যেসব কারখানার ইটিপি আছে, সেগুলোরও একটা অংশ খরচ বাঁচাতে ইটিপি বন্ধ রাখে; যার ফলে নদ-নদী, ফসলি জমি দূষিত হয়। আবার বায়ুদূষণ রোধে ১৬টি প্রতিষ্ঠানের এটিপি (এয়ার ট্রিটমেন্ট পান্ট) থাকার প্রয়োজন হলেও ৫টি প্রতিষ্ঠানের এটিপি অকার্যকর।[১০০]

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মাধবপুর থেকে হবিগঞ্জ পর্যন্ত ৫২ কিলোমিটারে অর্ধশতাধিক শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে। এসব শিল্প-কারখানার বিষাক্ত বর্জ্য সরাসরি মিশছে খাল-বিল ও জলাশয়ে। খাল-জলাশয় বেয়ে একই বর্জ্য বিষিয়ে তুলছে পার্শ্ববর্তী সুতাং নদীর পানি। এর মধ্যে হবিগঞ্জের অলিপুর এলাকায় গড়ে ওঠা শিল্প-কারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে ব্যাপকভাবে দূষিত হয়েছে নদীটি। শিল্পবর্জ্যের দূষণের কারণে নদী-তীরবর্তী বুলা, করাব, লুকড়া, নূরপুর, ব্রাহ্মণডোরা, রাজিউড়া, লাখাই সদরসহ বেশ কয়েকটি ইউনিয়নের গ্রামে কৃষি, স্বাস্থ্য ও দৈনন্দিন জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। শিল্পবর্জ্যের উৎকট গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকার মানুষজন। দূষণের কারণে নদী-তীরবর্তী প্রায় ৪০ কিলোমিটার এলাকার ফসলি জমি ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে। এই নদীতে একসময় প্রচুর মাছ পাওয়া গেলেও এখন তার দেখা নেই। এতে হুমকিতে পড়েছে কয়েক হাজার জেলের জীবন-জীবিকা। কৃষকরা সেচের কাজেও ব্যবহার করতে পারছে না সুতাংয়ের পানি। গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচ দিতে গিয়ে তাদের খরচ বেড়ে গেছে।[১০১]

যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের করা 'এনভায়রনমেন্টাল পারফরম্যান্স ইনডেক্স (ইপিআই)-২০১৮' শীর্ষক এক যৌথ গবেষণা অনুসারে, পরিবেশ রক্ষায় বিশ্বের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা দেশের একটি বাংলাদেশ, পরিবেশ রক্ষা সূচকে বিশ্বের ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৯। আফ্রিকার দারিদ্র্যপীড়িত দেশ বুরুন্ডি শুধু এই তালিকায় বাংলাদেশের নিচে রয়েছে। বায়ুর মান, পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন, ক্ষতিকর ভারী ধাতু, জীববৈচিত্র্য ও বাসস্থান, বনায়ন, মৎস্যসম্পদ, জলবায়ু ও জ্বালানি, বায়ুদূষণ, পানিসম্পদ এবং কৃষি–এই ১০টি বিষয়ের ওপর গবেষণার ভিত্তিতে প্রতি দুই বছর পর পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন দেশের অবস্থান তুলে ধরতে বৈশ্বিক এই সূচক প্রকাশ করা হয়। এর আগে ২০১৬ সালের তালিকায় ১৮০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৭৩। আর ২০১৪ সালের তালিকায় ১৭৮টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৬৯। অর্থাৎ প্রতিবছরই তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়েছে।[১০২]

বিশ্বব্যাংকের 'এনহ্যান্সিং অপরচুনিটিজ ফর ক্লিন অ্যান্ড রিজেলিয়েন্ট গ্রোথ ইন আরবান বাংলাদেশ : কান্ট্রি এনভায়রনমেন্টাল অ্যানালাইসিস-২০১৮' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে, দূষণ ও পরিবেশগত ঝুঁকির কারণে যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তার একটি বাংলাদেশ। বাংলাদেশে প্রতিবছর যত মানুষের মৃত্যু হয় তার ২৮ শতাংশই মারা যায় পরিবেশদূষণজনিত অসুখবিসুখের কারণে। কিন্তু সারা বিশ্বে এ ধরনের মৃত্যুর গড় মাত্র ১৬ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক ২০১৫ সালের এক পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেছে, শহরাঞ্চলে এই দূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, দূষণের কারণে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।[১০৩] ২০১৮ সালে আইকিউএয়ার, এয়ারভিস্যুয়াল ও গ্রিনপিসের এক গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে বায়ুদূষিত দেশের তালিকায় শীর্ষে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ। সেই সঙ্গে সবচেয়ে দূষিত ৩০ শহরের মধ্যে ঢাকার অবস্থান ১৭তম।[১০৪]

ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বা বর্জ্য পরিশোধনাগারে (ইটিপি) শোধন ছাড়াই শিল্প-কারখানা ও বিদ্যুৎকেন্দ্রের বর্জ্য নদীতে ফেলার কারণে দূষিত হচ্ছে দেশের নদ-নদী। পরিবেশ অধিদপ্তরের এক সমীক্ষা

অনুযায়ী দেশের ২৯টি প্রধান নদ-নদীর দূষণ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বিশেষত শুষ্ক মৌসুমে নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এগুলোর পানির দূষণ বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছাচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তর ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড ফিশ দেশের মাছের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৯টি নদী নিয়ে আরেকটি সমীক্ষা করেছে। তাতে দেখা গেছে, মাছের এসব উৎস মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে পড়েছে। এসব নদীর পানিতে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর মাত্রার ভারী ধাতু পাওয়া যাচ্ছে।[১০৫]

বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিরুদ্ধে কৃষিজমি, নদী ও বনের জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় সরেজমিন পরিদর্শনে সোনারগাঁ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিরুদ্ধে সংলগ্ন কৃষিজমি, জলাভূমি ও নিচু জমিতে বালি ভরাটের প্রমাণ পায়। মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিরুদ্ধেও বনের জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া নদীর জমি দখল ও নতুন জেগে ওঠা চরে বালি ফেলে স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগ ওঠে বেসরকারি উদ্যোগের আমান অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিরুদ্ধে।[১০৬]

গত ২৬ জুলাই ২০১৯-এ পরিবেশবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা গোবাল ফরেস্ট ওয়াচ থেকে প্রকাশিত বিশ্বের বনভূমি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০১ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ৩ লাখ ৭৮ হাজার একর বনভূমি উজাড় হয়েছে, যা দেশের মোট বনভূমির প্রায় ৮ শতাংশ। এর মধ্যে শুধু ২০১৭ সালেই দেশে সর্বোচ্চ, প্রায় ৭০ হাজার একর বনভূমি উজাড় হয়েছে। আর গত পাঁচ বছরে উজাড় হয়েছে ২ লাখ ৩১ হাজার ৪৩ একর বনভূমি। অন্যদিকে সরকারের বন বিভাগের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সশস্ত্র বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এ পর্যন্ত বরাদ্দ দেয়া মোট বনভূমির পরিমাণ ১ লাখ ৬০ হাজার। এর মধ্যে ১ হাজার ৮৯৩ একর বনভূমি একসময় সংরক্ষিত বন ছিল। বরাদ্দ দেয়ার সময় এসব বনভূমির সংরক্ষিত বনের সুরক্ষা বাতিল করা হয়।[১০৭]

উপসংহার

বর্তমান বাংলাদেশে উন্নয়নের নামে যা চলছে তা গোষ্ঠীতান্ত্রিক লুটেরা পুঁজির অবাধ লুণ্ঠন ছাড়া আর কিছুই নয়। দেশি-বিদেশি লুটেরা পুঁজি যত বেশি লুণ্ঠন করতে পারে, যত সস্তায় শ্রম ও পরিবেশ শোষণের সুযোগ পায়, তারা তত বেশি উন্নয়ন হচ্ছে বলে প্রচার করে। কিন্তু লুটেরা পুঁজির জন্য যা উন্নয়ন, সর্বজনের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তা অনুন্নয়ন। ব্যয়বহুল অপচয়মূলক প্রদর্শনবাদী মেগা প্রকল্পের মাধ্যমে কতিপয় দেশি-বিদেশি লুটেরা ফুলেফেঁপে উঠলেও তা সর্বজনের জীবনমানের সার্বিক অনুন্নয়ন ঘটাচ্ছে–জাতীয় আয়ে দরিদ্রদের অংশীদারত্ব কমছে, শ্রমিকরা বেঁচে থাকার মজুরি পাচ্ছে না এবং অনিরাপদ কর্মপরিবেশে নিয়মিত মৃত্যু বরণ করছে, অকালে লাশ হয়ে দেশে ফিরছে প্রবাসী শ্রমিকরা, বেকার তরুণরা মর্যাদাপূর্ণ কাজ পাচ্ছে না, মরিয়া হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পথে বিদেশ যেতে গিয়ে মরছে, সুলভে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে না নাগরিকরা, পরিবহন মাফিয়াতন্ত্রের দাপটের মধ্যে ব্যয়বহুল উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে মৃত্যুর মহামারি, প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের পরিসংখ্যান বিশুদ্ধ পানি, নিরাপদ খাদ্য ও পরিবেশের নিশ্চয়তা দিতে পারছে না–বায়ুর মান, পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন, ক্ষতিকর ভারী ধাতু, জীববৈচিত্র্য, বনায়ন, মৎস্যসম্পদ, জলবায়ু ও জ্বালানি, বায়ুদূষণ, পানিসম্পদ–সমস্ত দিক থেকেই দিন দিন অবনমন ঘটছে পরিস্থিতির। এ পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাতে হলে ক্ষমতাবানদের উন্নয়নের বয়ানকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে, তাদের তৈরি উন্নয়নের মাপকাঠিকে প্রত্যাখ্যান করে সর্বজনের উন্নয়ন ধারণার বিকাশ ঘটাতে হবে।

কল্লোল মোস্তফা: প্রকৌশলী, লেখক, গবেষক।
ইমেইল: kallol_mustafa@yahoo.com

তথ্যসূত্র

১। State of the Bangladesh Economy in FY 2017-18, CPD, 13 January 2018, Dhaka http://cpd.org.bd/wp-content/uploads/2018/01/IRBD-FY2018-First-Reading_Paper-Final-13012017.pdf
২। ১০ বছরে নতুন কোটিপতি ৫৬ হাজার, বাংলা ট্রিবিউন, ৪ অক্টোবর ২০১৯
৩। দশ বছরে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা, বাংলা ট্রিবিউন, ২৮ জানুয়ারি ২০১৯
৪। বিস্তারিত দেখুন, ব্যাংক কেলেঙ্কারি বা লুণ্ঠনের মেগাসিরিয়াল : প্রেক্ষিত, প্রবণতা ও পদ্ধতি, *সর্বজনকথা*, আগস্ট-অক্টোবর ২০১৮
৫। সাত বছরে আত্মসাৎ ৩০ হাজার কোটি টাকা, প্রথম আলো, ২৭ মার্চ ২০১৬
৬। লোভের ফাঁদ তৈরি করে শেয়ার কারসাজি, প্রথম আলো, ১২ এপ্রিল ২০১১
৭। উত্থানে যারা পতনেও তারা, প্রথম আলো, ১১ এপ্রিল ২০১১
৮। ৯ বছরে বেড়েছে সাড়ে ৩ গুণ, প্রথম আলো, ২২ নভেম্বর ২০১৭
৯। খেলাপি ঋণ বাড়ছে বেসরকারিতেও, প্রথম আলো, ২৯ আগস্ট ২০১৯
১০। 'ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন পরিশোধসংক্রান্ত বিশেষ নীতিমালা', ১৬ মে ২০০৯, বাংলাদেশ ব্যাংক https://www.bb.org.bd/mediaroom/circulars/brpd/may162019brpd05.pdf
১১। বিশ্বে অতি ধনীর উত্থানে শীর্ষে বাংলাদেশ, প্রথম আলো, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮
১২। ধনী বৃদ্ধির হারে বিশ্বে তৃতীয় বাংলাদেশ, প্রথম আলো, ১৯ জানুয়ারি ২০১৯
১৩। গরিব মানুষের বসবাসে বিশ্বে পঞ্চম বাংলাদেশ, প্রথম আলো, ২০ জানুয়ারি ২০১৯
১৪। মজুরি বৃদ্ধির হার বাংলাদেশেই কম, প্রথম আলো, ৩ জানুয়ারি ২০১৭
১৫। ঢাকার শিল্প-কারখানার শ্রমিক মজুরি জীবনমানে উত্তীর্ণ নয়, বণিক বার্তা, ২৪ জানুয়ারি ২০১৯
১৬। ঋণ নিয়ে জীবন চালান ৮৭ শতাংশ পোশাক শ্রমিক, বণিক বার্তা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
১৭। শিল্প আরও বড় হচ্ছে তবে নারী শ্রমিকরা রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন, বণিক বার্তা, ১৩ অক্টোবর ২০১৮
১৮। নিট শ্রমিকদের দেয়া হবে আয়রন ট্যাবলেট, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ৩১ মার্চ ২০১৯
১৯। দেলোয়ারসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে শিগগিরই অভিযোগপত্র, প্রথম আলো, ২৪ নভেম্বর ২০১৩
২০। রানা পাজা ধসের দুই মামলা : তদন্ত শেষই হল না, প্রথম আলো, ২৪ এপ্রিল ২০১৪
২১। ৪১ মৃত্যুর পেছনে কারও দায় নেই?, প্রথম আলো, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭
২২। বিগত বছরে কর্মক্ষেত্রে প্রতি মাসে গড়ে ৪৯ প্রাণহানি, বণিক বার্তা, ৫ জানুয়ারি ২০১৯
২৩। রেমিট্যান্স বেড়েছে ১৭ শতাংশ, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২ জুলাই ২০১৮
২৪। প্রবাসী আয়ে রেকর্ড বাংলাদেশের, প্রথম আলো, ২ জুলাই ২০১৯
২৫। প্রবাসে শ্রমিকের ৬২ শতাংশ মৃত্যুর কারণ স্ট্রোক, প্রথম আলো, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯

২৬। আট মাসে ফিরলেন ৮০০ নারী গৃহকর্মী, প্রথম আলো, ২৮ আগস্ট ২০১৯
২৭। বড় ও মাঝারি শিল্প-কারখানা কমেছে, প্রথম আলো, ৩০ মে ২০১৯
২৮। আইএলওর প্রতিবেদন : তরুণ বেকারের হার ৭ বছরে দ্বিগুণ, প্রথম আলো, ১৮ নভেম্বর ২০১৮
২৯। ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে নিহতদের অধিকাংশই বাংলাদেশি, প্রথম আলো অনলাইন, ১২ মে ২০১৯; সাগরপথে ইউরোপ যাত্রা, নৌকা ডুবে ৩৫ বাংলাদেশির মৃত্যু, যুগান্তর, ২৫ জুন ২০১৮
৩০। এত গণকবর!, সমকাল, ২৬ মে ২০১৫
৩১। মানব পাচার বেড়েছে ৬১ শতাংশ, প্রথম আলো, ৮ মে ২০১৫
৩২। মানব পাচার থামছেই না, প্রথম আলো, ১৬ মে ২০১৯
৩৩। ফ্লাইওভারের খরচ বাংলাদেশে সর্বোচ্চ, কালের কণ্ঠ, ৩১ মে ২০১৬
৩৪। সময় যাচ্ছে, খরচ ও দুর্ভোগ বাড়ছে, প্রথম আলো, ১১ জানুয়ারি ২০১৬; উন্নয়ন-দুর্ভোগের নাম মগবাজার ফ্লাইওভার, সমকাল, ৬ জুন ২০১৭
৩৫। দেশের দীর্ঘতম উড়াল সড়ক চালু, প্রথম আলো, ১২ অক্টোবর ২০১৯
৩৬। Hanif flyover fails to pay off, দ্য ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ১৫ জুলাই ২০১৭; হানিফ ফ্লাইওভারের নিচে ময়লার ভাগাড়, বাংলা ট্রিবিউন, ২২ মার্চ ২০১৮; যত জঞ্জাল হানিফ ফ্লাইওভারের নিচে, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৬ আগস্ট ২০১৬
৩৭। Performance evaluation of Jatrabari-Gulistan Flyover Mayor Mohammad Hanif Flyover constructed over rail-road level crossing in Dhaka, Md Rakibul Islam, Nafis Anwari, Md. Shamsul Hoque, August 2018
৩৮। ফ্লাইওভার নগরের গতি কমাচ্ছে কি?, বণিক বার্তা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭
৩৯। মহাসড়ক নির্মাণ ব্যয়ে শীর্ষে বাংলাদেশ, কালের কণ্ঠ, ২১ জুন ২০১৬
৪০। মহাসড়ক নির্মাণ সবচেয়ে ব্যয়বহুল হচ্ছে বাংলাদেশে, বণিক বার্তা, ৬ অক্টোবর ২০১৫
৪১। মহাসড়ক নির্মাণ ব্যয়ে শীর্ষে বাংলাদেশ, কালের কণ্ঠ, ২১ জুন ২০১৬
৪২। Dhaka-Ctg Highway Expansion: Example of wasting public money, ডেইলি স্টার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৪৩। পদ্মা সেতু প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় দুটোই বাড়ছে, প্রথম আলো, ১৯ আগস্ট ২০১৯; পদ্মা সেতুর ব্যয় ৩০ হাজার কোটি টাকা ছাড়াল, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২১ জুন ২০১৮
৪৪। দুই বছরও টিকছে না নতুন সড়ক!, সমকাল, ২৮ জুলাই ২০১৮; জোড়াতালির চক্রে সড়ক-মহাসড়ক, প্রথম আলো, ২৭ জুলাই ২০১৯; Dhaka-Ctg Highway Expansion: Example of wasting public money, ডেইলি স্টার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৪৫। উদ্বোধনের আগেই দেবে যাচ্ছে ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪ লেন, বণিক বার্তা, ৬ জুলাই ২০১৯
৪৬। সড়ক দুর্ঘটনায় দশ বছরে নিহত সাড়ে ২৫ হাজার : সংসদে কাদের, সমকাল, ১২ জুন ২০১৯
৪৭। সড়ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন নয় লাখ ভুয়া চালক, প্রথম আলো, ৩ আগস্ট ২০১৮
৪৮। এত প্রকল্প, তবু সড়কে নৈরাজ্য, প্রথম আলো, ২১ মার্চ ২০১৯
৪৯। যানজটে বিশ্বে প্রথম স্থান অর্জন করল ঢাকা, ইত্তেফাক, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
৫০। মেয়াদ বাড়ছে, ভর্তুকির চাপও থাকছে, প্রথম আলো, ২৩ ডিসেম্বর ২০১২
৫১। উচ্চমূল্যের শীর্ষ পাঁচ বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র, বণিক বার্তা, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
৫২। ১১ কেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ দুই হাজার কোটি টাকা, শেয়ার বিজ, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৫৩। পিডিবির বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৭-১৮, পৃষ্ঠা ১০০-১০২
৫৪। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের লোকসানের ৮২ শতাংশই বিদ্যুৎ খাতের, বণিক বার্তা, ১৫ জুন ২০১৯
৫৫। চাহিদা নেই, তবু নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র, প্রথম আলো, ২৩ আগস্ট ২০১৯
৫৬। পুঁজিলগ্নিতে সর্বোচ্চ মুনাফা কি বিদ্যুতে?, বণিক বার্তা, ৪ ডিসেম্বর ২০১৭
৫৭। গ্যাজপ্রমের সঙ্গে ১৯ কোটি ডলারের চুক্তি, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২৬ এপ্রিল ২০১২
৫৮। Gazprom drilling award to cost twice the local rate, ঢাকা ট্রিবিউন, ১ জুলাই ২০১৫
৫৯। বাপেক্সের রূপকল্পে গ্যাজপ্রমের থাবা, বণিক বার্তা, ৯ অক্টোবর ২০১৬
৬০। গ্যাসকূপ খননে চুক্তির শর্ত মানছে না গ্যাজপ্রম, সমকাল, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৭; Gazprom exempted from liability of damage, নিউ এজ, ৩০ আগস্ট ২০১৭
৬১। পেট্রোবাংলার ইতিহাস, পেট্রোবাংলার ওয়েবসাইট, সর্বশেষ প্রবেশ ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ
৬২। সাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে চুক্তি, সমকাল, ৮ ডিসেম্বর ২০১৬; Posco Daewoo signs contract for gas exploration, ডেইলি স্টার, ৮ ডিসেম্বর ২০১৯
৬৩। IOCs can now export gas, ডেইলি স্টার, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৬৪। $11.38b loan deal signed for nuclear power plant, ডেইলি স্টার, ২৭ জুলাই ২০১৬
৬৫। The Power and Energy Sector of Bangladesh: Challenges of Moving beyond the Transition Stage, সিপিডি, ১০ মার্চ ২০১৯
৬৬। সিপিজিসিবিএলের ওয়েবসাইট, সর্বশেষ প্রবেশ করা হয়েছে ২১ সেপ্টেম্বর
http://www.cpgcbl.gov.bd/site/page/5aa213a7-eea4-4163-9417-d604a1a0f8fb/-
৬৭। বিদ্যুৎ হাব : পায়রার তীরে মহাযজ্ঞ, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৭
৬৮। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ শুরু হচ্ছে, প্রথম আলো, ১৮ এপ্রিল ২০১৭
৬৯। বিদ্যুতের দাম বাড়ল, প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০১০
৭০। মধ্যবিত্তের খরচ বাড়ছে, প্রথম আলো, ২৪ নভেম্বর ২০১৭
৭১। বিদ্যুতের দাম ফের বাড়ল, ইত্তেফাক, ২৪ নভেম্বর ২০১৭; বিইআরসির প্রেস রিলিজ, ২৩ নভেম্বর ২০১৭
৭২। গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির এই পরিসংখ্যান তৈরিতে ব্যবহৃত তথ্যসূত্র : গ্যাসের দাম বেড়েছে, প্রথম আলো, ২ আগস্ট ২০০৯; দাম বাড়ল গ্যাস-বিদ্যুতের, ভোরের কাগজ, ২৮ আগস্ট ২০১৫; গ্যাসের মূল্য : আবাসিক-বাণিজ্যিকে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি, বাংলা ট্রিবিউন, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭; গ্যাসের দাম বাড়ল ৩২.৮ শতাংশ, বণিক বার্তা, ২০ জুলাই ২০১৯; বিইআরসির গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রজ্ঞাপন, ৩০ জুন ২০১৯
৭৩। Global Health Observatory data repository, 2017 WHO http://apps.who.int/gho/data/node.main.HWFGRP?lang=en
74| Monitoring progress on universal health coverage and the health-related Sustainable Development Goals in the South-East Asia Region: 2018 update, WHO
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274313/9789290226628-eng.pdf
৭৫। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ বুলেটিন-২০১৮, পৃষ্ঠা ৭
৭৬। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা ২৩
৭৭। Monitoring progress on universal health coverage and the health-related Sustainable Development Goals in the South-East Asia Region: 2018 update, WHO
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274313/9789290226628-eng.pdf
৭৮। Global Health Expenditure Database, WHO, 2016

http://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/en
চিকিৎসা ব্যয় বাড়ছে, মানুষ ভুগছে, প্রথম আলো, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
৭৯। ভারতে বিদেশি চিকিৎসাগ্রহীতার ৪৫ শতাংশ বাংলাদেশি, বণিক বার্তা, ১২ জুলাই ২০১৯
৮০। শিক্ষা-স্বাস্থ্যে সবচেয়ে কম ব্যয় করে বাংলাদেশ, প্রথম আলো, ২৩ জুন ২০১৮
৮১। Bangladesh Education Statistics 2018, Chapter One: Summary Statistics and KPIs
http://data.banbeis.gov.bd/images/ban222.pdf
৮২। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক প্রভাবের দীর্ঘ ছায়া, প্রথম আলো, ২৮ এপ্রিল ২০১৯
৮৩। নীতিমালা ভেঙে ডাক্তার গড়ার কারবার, প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০১৯
৮৪। Bangladesh Education Statistics 2018, Banbeis
http://data.banbeis.gov.bd/images/esum.pdf
৮৫। Bangladesh Education Statistics 2018, Banbeis
http://data.banbeis.gov.bd/images/esum.pdf
৮৬। অতিদরিদ্রদের মাত্র ৪ শতাংশ মাধ্যমিক পেরোতে পারছে, বণিক বার্তা, ১৭ মে ২০১৮
৮৭। অনিরাপদ পানি পান করছে সাড়ে সাত কোটি মানুষ, প্রথম আলো, ১২ অক্টোবর ২০১৮
৮৮। পানি-স্যানিটেশন বরাদ্দে ৪ ওয়াসা আর রাজনীতির প্রাধান্য, প্রথম আলো, ২১ মার্চ ২০১৯
৮৯। চারদিকে পানি আর পানি তবু তেষ্টার জল নেই, প্রথম আলো, ১০ মে ২০১৯
৯০। পাহাড়ের ছড়াগুলো শুকাচ্ছে, কষ্টে চার গ্রামের মানুষ, প্রথম আলো, ২১ মার্চ ২০১৯
৯১। ঢাকা ওয়াসা : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), এপ্রিল ২০১৯
https://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2019/report/dhaka-wasa/DWASA_EX_Bangla.pdf
৯২। ওয়াসার পানিতে পাওয়া গেল ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, মলের জীবাণু, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৪ জুলাই ২০১৯; ওয়াসার পানিতে পাওয়া গেল ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া, মলের জীবাণু, ঢাকা ট্রিবিউন বাংলা, ৩ জুলাই ২০১৯
৯৩। গভীর নলকূপে গভীর সমস্যা, প্রথম আলো, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯
৯৪। মিল্ক ভিটা, আড়ং, প্রাণসহ ১১ ব্র্যান্ডের দুধে মাত্রাতিরিক্ত সিসা, বিষাক্ত ক্যাডমিয়াম, ঢাকা ট্রিবিউন বাংলা, ১৬ জুলাই ২০১৯
৯৫। আড়ং-ইগলু-মিল্কভিটা-প্রাণসহ সাত দুধে ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক, ইত্তেফাক, ২৬ জুন ২০১৯
৯৬। মাটি পানি হয়ে চালেও বিষ, কালের কণ্ঠ, ৩ মার্চ ২০১৯
৯৭। প্রচলিত প্রযুক্তিতে বুড়িগঙ্গার পানি শোধন অসম্ভব!, প্রথম আলো, ১৮ এপ্রিল ২০১১
৯৮। শিল্পবর্জ্যের এক-চতুর্থাংশই প্রিন্টিং ও ডায়িং কারখানার, বণিক বার্তা, ২ এপ্রিল ২০১৬
৯৯। https://www.conserve-energy-future.com/most-polluted-rivers-world.php, ওয়েবসাইটটিতে সর্বশেষ প্রবেশ করা হয়েছে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯-এ
১০০। অর্থ আছে, জীবন নেই, প্রথম আলো, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯
১০১। শিল্প বিপ্লবে অচেনা হবিগঞ্জ, চেনা দূষণ, বণিক বার্তা, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮
১০২। পেছনের সারিতে বাংলাদেশ, প্রথম আলো, ২৬ জানুয়ারি ২০১৮
১০৩। পরিবেশদূষণের কারণে বাংলাদেশে এক বছরে মারা গেছে ৮০ হাজার মানুষ : বিশ্বব্যাংক, বিবিসি বাংলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮
১০৪। বিশ্বে সবচেয়ে বায়ুদূষিত দেশের তালিকায় প্রথম বাংলাদেশ, ইত্তেফাক অনলাইন, ৬ মার্চ ২০১৯
১০৫। ২৯ নদীর দূষণ বিপজ্জনক স্তরে, প্রথম আলো, ২২ মার্চ ২০১৯
১০৬। পরিবেশ ইস্যুতে বিতর্কিত হয়ে পড়ছে অর্থনৈতিক অঞ্চল, বণিক বার্তা, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮
১০৭। ২ লাখ ৮০ হাজার একর বনভূমি বেদখল, প্রথম আলো, ৪ আগস্ট ২০১৯

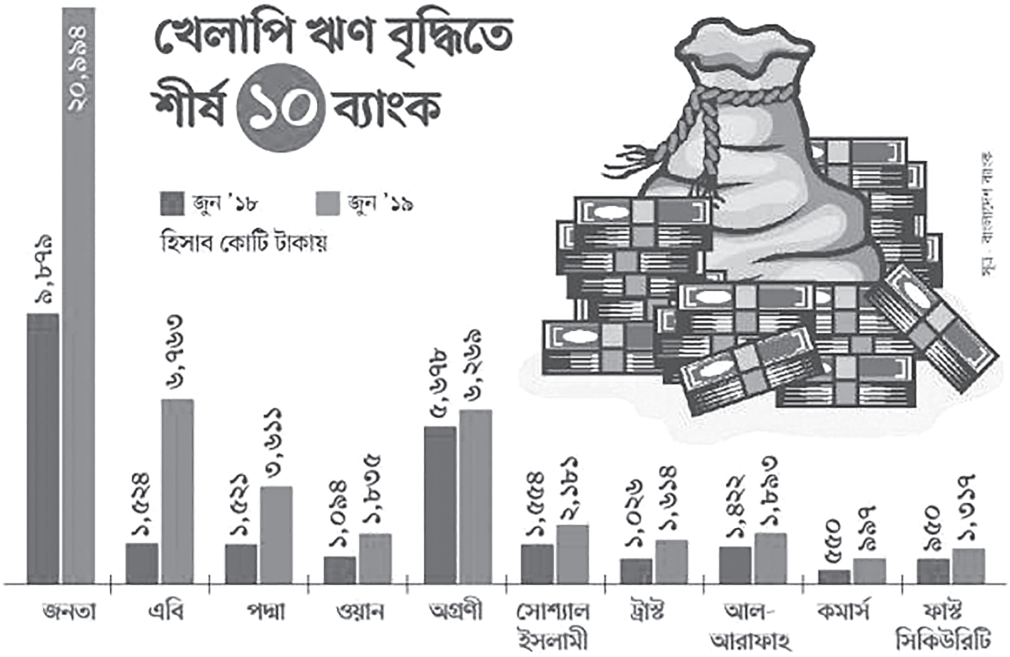

তথ্যসূত্র: ২৯ আগস্ট ২০১৯, প্রথম আলো